গণিতের রঙ্গে

হাসিখুশি গণিত

চমক হাসান

গণিতের রঙ্গে

হাসিখুশি গণিত

চমক হাসান

মাইনাস মাইনাসে হয় প্লাস, শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে হয় অসংজ্ঞায়িত, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 'হাপিন্টুভুমিন্টুচ্চতা' ($1/_2$ × ভূমি × উচ্চতা), $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$– গণিত করতে গিয়ে এমন অনেক কিছু আমরা শিখি, মুখস্থ করি। কিন্তু জানি কি— কেন হয়, কিভাবে হয়? বুঝি কি অন্তর থেকে? এগুলো কি Feel করা সম্ভব?

এই বইটি যতটা জ্ঞানের তার থেকে বেশি আনন্দের, চিন্তার আনন্দের লেখক মনে করেন, গণিত পৃথিবীর সবচেয়ে মজার বিষয়। অনেক মানুষ এটাকে ভয় পায় কারণ মজার অংশগুলো তাদের জানানো হয় না। কেমন অদ্ভুত ছিল গণিতবিদদের জীবন? আসলে কে আবিষ্কার করেছিল পিথাগোরাসের উপপাদ্য? কিভাবে মাথায় এল আইডিয়াটা? তিন মেয়ের সমস্যাটা কী ছিল? মাথায় চুলের সংখ্যা কত? অনন্ত জলিল গণিত নিয়ে সিনেমা বানালে কী সংলাপ বলতেন? এমন মজার সব চিন্তা, সমস্যা আর গল্প নিয়েই *গণিতের রঙ্গে: হাসিখুশি গণিত*।



গণিতের রঙ্গে
হাসিখুশি গণিত

গণিতের রঙ্গে

হাসিখুশি গণিত

চমক হাসান

আদর্শ ॥ ২০১৫

গণিতের রঙে: হাসিখুশি গণিত

২য় সংস্করণ ১৩ ফাল্গুন ১৪২১, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
১ম সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ ২৯ মাঘ ১৪২১, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ ১৯ মাঘ ১৪২১, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রকাশক ॥ মামুন অর রশিদ
আদর্শ ॥ ১৭৬ ফকিরের পুল ঢাকা ১০০০
✆ ০১৭১২-২৯১৬৪৪, ০১১৯১-২৩২৭৭৪

প্রচ্ছদ ॥ মানবেন্দ্র গোলদার
ব্যবস্থাপনা ॥ খাইরুল ইসলাম, আদর্শ সার্ভিস
মুদ্রণ ॥ শিহাব উদ্দিন কর্তৃক আদর্শ প্রিন্টিংস
বাংলাদেশে মুদ্রিত ও বাঁধাইকৃত

অনলাইনে অর্ডার: www.adarshabd.com
www.rokomari.com/adarsha

মূল্য ২০০ টাকা

Ganiter Range: Hasikhushi Ganit
by Chamok Hasan
Published by Mamun Or Rashid of Adarsha
176 Fakirerpool (3rd floor), Motijheel, Dhaka-1000
https://www.adarshabd.com
e-mail info@adarshabd.com
First Published February 2015

Price Tk. 200 :: US$ 5

ISBN 978-984-8875-86-5

উৎসর্গ

একজন মহীয়সী নারী, যিনি প্রচণ্ড সামজিক বাধা, তীব্র মানসিক কষ্ট, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতায়াতের অসহনীয় দুর্ভোগ, চাকরির অস্থিতিশীলতা– সবকিছু উপেক্ষা করে গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমিয়েছিলেন শুধুমাত্র তার সন্তানের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।

আর একজন অসাধারণ মানুষ, যাকে নিজের জন্য ভাবতে দেখিনি কখনও! গ্রাম থেকে শহর, দেশ থেকে দেশে চষে বেড়িয়েছেন, মানুষের জন্য কাজ করার নেশা ছাড়েননি। নিজের জন্য নয়, মানুষের জন্য বাঁচার কী আনন্দ, তাকে দেখে বুঝি!

আম্মু, আব্বু–

আমি যতটুকু, সেটা তোমাদের জন্যই। তোমরা বৃত্তের বাইরে ভাবতে পেরেছিলে বলেই আমি স্বপ্ন দেখতে পারি। কত অল্পতেই ভালো থাকা যায়, তোমাদের জন্যই জানি। জীবনের গণিত তোমাদের থেকেই শেখা।



সূচি

লেখকের কথা

সুন্দর চিন্তা অনেক আনন্দের একটা ব্যাপার। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, খাবারের সংস্থান থাকলে, শুধু চিন্তার আনন্দেই একটা অর্থবহ জীবন পার করে দেয়া যায়! গণিত হলো গুছিয়ে চিন্তা করার ভাষা, বিজ্ঞানের ভাষা। গণিতের আনন্দ পেতে হলে গণিত অনুভব করতে হয়। আমার আনন্দ অনেকগুণে বেড়ে যাবে, যদি দেখি আমার মতো আরও অনেক মানুষ আনন্দটা অনুভব করছে। ইউটিউবে 'গণিতের রঙ্গে' শুরু করেছিলাম এ জন্যেই– গণিতের রঙ্গ, মজা সবার ভেতর ছড়িয়ে দিতে।

শুরুটা সুখের ছিল না! যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করতে এলাম ২০১১ তে। রান্নাবান্না পারি না, গাড়ি চালাতে পারি না, বাইরে খেতেও যেতে পারি না। রুমমেট ইফতেখার হোসেন শোভন ভাই রান্না করেন, আমি অবনত মুখে খাই। ডিসেম্বরে ভাইয়া দেশে গেলেন, অবস্থা তখন আরও খারাপ! একটা ছবি তোলার ক্যামেরা দিয়ে যখন গণিতের রঙ্গে প্রথম পর্ব শুট করি, আমি প্রায় দেড়দিন না খাওয়া! কিন্তু কী খুশি আমি! গণিতের আনন্দগুলো মানুষ একটু একটু করে অনুভব করবে- ভাবতেই মন খুশি হয়ে উঠছিল। ট্রাইপড নেই, লাইটের স্ট্যান্ডে স্কচটেপ দিয়ে ক্যামেরা ঝুলিয়ে দিলাম। রেকর্ড বাটন চাপ দিয়ে দৌড় দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াই,অঙ্গভঙ্গি করি, ফিরে এসে দেখি কেমন দেখাচ্ছে। কোনমতে রাত ৩ টায় শেষ হলো, আপলোড করলাম। বহু মানুষ দেখে ফেলল। যাত্রা হলো শুরু!

ভিডিওগুলো করার সময় সাহায্য পেয়েছি অনেক। নাবিউল আফরোজ রাফি ভাইয়ের ক্যামেরা, ইশতিয়াক রউফ ভাইয়ের ট্রাইপড, ফজলে রাব্বি ভাইয়ের বানানো টি-শার্ট, বন্ধু মাহফুজ সিদ্দিকী হিমালয়ের সৎ সমালোচনা, কামরুজ্জামান কামরুল আর সাকিব রংপুরীর ব্যর্থ প্রচেষ্টা– কত গল্প এগুলোর পিছনে!

ভিডিওগুলো যারা দেখেছেন তারাই ছিলেন আমার মূল অনুপ্রেরণা। আরও বহু মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। গণিতবিদ বন্ধু সৌমিত্র চক্রবর্তী,

সংখ্যাপ্রেমী অভীক রায় আর শ্রদ্ধাভাজন সুব্রত দেবনাথ দাদার সাথে 'সংখ্যাভ্রমণ', শ্রদ্ধেয় মুনির হাসান ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড অ্যাকাডেমিক দলে কাজ করা, মাহমুদুল হাসান সোহাগ ভাইয়া আর আবুল হাসান লিটন ভাইয়ার মাধ্যমে 'উদ্ভাস' এ গণিত পড়ানো– এগুলো করতে গিয়েই বুঝেছি শেখা আর শেখানোর আনন্দ! আমার সহধর্মিনী ফিরোজা বহ্নি গণিতময় অত্যাচারগুলো সহাস্যে উড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সবসময়। আদর্শ'র প্রকাশক মামুন অর রশিদ ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ, তার উদ্যোগ ছাড়া এই বইটি আলোর মুখ দেখত না। ধন্যবাদ আদর্শ'র রাশেদ ইসলামকে, তিনি বহু সময় নিয়ে ধরে ধরে সবগুলো ভিডিও অনুলিখন করেছেন।

প্রিয় পাঠরত মানুষ, ধন্যবাদ আপনাকেও, আপনি পড়েন বলেই আমি লেখার সাহস পাই! যে বইটি আপনার হাতে, সেটি হাজার মানুষের ভালোবাসার ফসল। এই বইটি পড়ে যদি আপনার ভেতর গণিতের অদ্ভুত মায়াময় জগতটাতে ঘুরে আসার সামান্য আগ্রহ জাগে তাহলেই আমাদের শ্রম সার্থক!

চমক হাসান

১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
যুক্তরাষ্ট্র

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ১

আল মুকাবালা

আমি আমার অন্তর থেকে বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বিষয়টা হচ্ছে গণিত। এখন আমি যদি মানুষকে বলি এটা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর বিষয়, সবচেয়ে মজার বিষয়, মানুষ কেন আমাকে বিশ্বাস করবে? এজন্য আমি চিন্তা করলাম যে, কিছু ভিডিও করে যাব যেখানে ম্যাথমেটিকসের খুব মজার কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে।

প্রথমেই যার নাম মাথায় আসছে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ ইবনে মুসা আল খোয়ারিজমি। আজ থেকে ১২০০ বছর আগের একজন গণিতবিদ। আমরা অনেকেই 'অ্যালগরিদম' শব্দটা বোধহয় শুনেছি। গণিত এবং কম্পিউটার সায়েন্সের খুব পরিচিত একটা শব্দ অ্যালগরিদম। অ্যালগরিদম শব্দটা আসলে তার নাম থেকে এসেছিল! আল খোয়ারিজমি থেকে, আল খরিজম– আল খরিজম থেকে অ্যালগরিদম! যাহোক, এই যে আল খোয়ারেজমি, তার একটা বিখ্যাত বই ছিল। বইটার নামটা কিন্তু ছোট্ট– *আল কিতাব আল মুখতাসার ফি হিসাব ওয়াল যাবুর ওয়াল মুকাবালা*। 'আল যাবুর'ই আসলে ম্যাথমেটিকসে খুবই বিখ্যাত হয়ে আছে। এই "আল যাবুর" থেকেই অ্যালজেবরা নামটা এসেছিল! আর তিনি 'আল যাবর ওয়াল মুকাবালা' এটা দিয়ে আসলে গণিতের দুইটা পদ্ধতির কথা বলতে চেয়েছিলেন। তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন– এটাই এবার দেখা যাক।

আল যাবুর কী ছিল? মূসা বললেন, আল যাবুর হচ্ছে এরকম: *যদি* $x+3=5$ *হয়, তাহলে* $x=5-3$

এটাই! সহজ কথায় এটা হচ্ছে পক্ষান্তর করা!

তাহলে **আল মুকাবালা** কী জিনিস? তিনি বললেন–

যদি $x+3=5+3$ *হয় তাহলে দুই পাশ থেকে* 3 *আর* 3 *মুকাবালা। থাকবে* $x=5$। অর্থাৎ আমরা যে কাটাকাটি করি সেটাই ছিল তার মুকাবালা!

মুকাবালা আবার দুই রকম– গুণের মুকাবালা আর যোগের মুকাবালা। যদিও এখন অনেক সহজ লাগছে, এই ব্যাপারগুলোর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে এখনকার বীজগণিত। আল খোয়ারিজমিকেই বলা হয় বীজগণিতের জনক।

মুসা আল খোয়ারিজমির পালা যাক। আমি এখন স্মরণ করছি আমার গুরুকে যাকে বলা হয় ইতিহাসের First true mathematician (প্রথম প্রকৃত গণিতবিদ)। তিনি হচ্ছেন মহান পিথাগোরাস। ম-হা-ন পিথাগোরাস। এই যে মহান পিথাগোরাস, তিনি কী ধরনের মানুষ ছিলেন? পিথাগোরাস চিন্তা করতেন এই পৃথিবীর সবকিছুই আসলে সংখ্যা দিয়ে তৈরি। তিনি বলতেন এক হচ্ছে ইশ্বরের সংখ্যা, দুই হচ্ছে প্রথম নারী সংখ্যা, তিন হচ্ছে প্রথম পুরুষ সংখ্যা এবং দুই আর তিন যোগ করলে পাঁচ হয়, পাঁচ হচ্ছে বিবাহ সংখ্যা! সবকিছুকেই তিনি কেমন যেন 'সংখ্যা সংখ্যা' করে চিন্তা করতেন। তো একবার তার এক ছাত্র এসে তাকে জিজ্ঞেস করল–

–'গুরু, ও গুরু, আচ্ছা গুরু– বন্ধুত্ব কী জিনিস?' গুরু তো সবকিছু চিন্তা করেন সংখ্যা নিয়ে। তিনি বললেন, –'বন্ধুত্ব, হুম, এটা আমি বুঝি। আহ! বন্ধুত্ব! আসলে ২২০ আর ২৮৪– এদের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকেই বলে বন্ধুত্ব'। শুনে ছাত্রের তো মাথা খারাপ!

–'গুরু এটা আবার কী বললেন? একটু ব্যাখ্যা করেন না'!

–'দাঁড়া ! বোঝাচ্ছি! এদিকে আয়– ২২০ এর যে উৎপাদকগুলো আছে সেগুলোর দিকে তাকা। উৎপাদক বুঝিস তো? যেসব সংখ্যা দিয়ে ২২০ কে নিঃশেষে ভাগ করা যায়। দ্যাখ, ২২০ এর উৎপাদক কী কী? ২২০ এর উৎপাদক হচ্ছে ১, ২, ৪, ৫, ১০, ১১, ২০, ২২, ৪৪, ৫৫, ১১০, ২২০। আর ২৮৪ এর উৎপাদক কী কী? ২৮৪ এর উৎপাদক হচ্ছে ১, ২, ৪, ৭১, ১৪২, ২৮৪। তুই কি জানিস **'প্রকৃত উৎপাদক'** বা **'proper divisor'** কাকে বলে'?

–'না তো গুরু!'

–'তাহলে শোন। প্রতিটা সংখ্যা দিয়ে তো ঐ সংখ্যা নিজেকেই ভাগ করা যায়, ভাগফল হয় ১। তার মানে প্রতিটা সংখ্যা নিজেই নিজের উৎপাদক। এই নিজেকে বাদ দিলে বাকি যে উৎপাদকগুলো থাকে সেইগুলো হচ্ছে 'প্রকৃত উৎপাদক'। মানে হচ্ছে, ধর ২২০ এর ক্ষেত্রে ২২০ কে বাদ দিলে

বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে ২২০ এর প্রকৃত উৎপাদক। তাহলে বল তো ২৮৪ এর প্রকৃত উৎপাদক কোনগুলো হবে?'
–'কেন গুরু এই যে ২৮৪ বাদ দিয়ে বাকিগুলো।
–'Good। এখন এর মধ্যে বন্ধুত্ব কোত্থেকে এলো তাই না? দ্যাখ। এই ২২০ এর সমস্ত প্রকৃত উৎপাদক তুই যদি যোগ করিস, তাহলে পাবি ২৮৪। আর ২৮৪ এর সমস্ত প্রকৃত উৎপাদক যদি তুই যোগ করিস তাহলে পাবি ২২০।
১+২+৪+৫+১০+১১+২০+২২+৪৪+৫৫+১১০=২৮৪ এবং ১+২+৪+৭১+১৪২=২২০।এরা দু'জন দু'জনার জন্য, একজনের ভেতরে অন্যজনের বসবাস। আর এজন্যই এরা আসলে বন্ধু!'

এবং এখন পর্যন্তও আসলেই ২২০ এবং ২৮৪ এদের **বন্ধু সংখ্যা** বা **Amicable Numbers** বলা হয়। বন্ধু দিবসে এখন বন্ধুকে মেসেজ পাঠাতে পারো, 'আমাদের বন্ধুত্ব ২২০ আর ২৮৪ এর মতো হোক!' (পরবর্তীতে এরকম সংখ্যা আরো পাওয়া গেছে, যেমন: 1184 আর 1210, 2620 আর 2924 ইত্যাদি)। যাই হোক এরকম করে ম্যাথমেটিকস নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। কখনো সংখ্যা নিয়ে, কখনো সমীকরণ নিয়ে, কখনো অন্যরকমের জিনিসপত্র নিয়ে। আমার সব সময় ইচ্ছে করত যে, গণিতের এই ধারণাগুলো কিভাবে বিকশিত হলো সেটা দেখা। যেমন: আমরা জানি 'পিথাগোরাসের উপপাদ্য' বলে একটা ব্যাপার আছে। এই যে পিথাগোরাসের উপপাদ্য– এটা কে আবিষ্কার করেছিল? শুনে মনে হতে পারে কেন পিথাগোরাসের উপপাদ্য আবার কে আবিষ্কার করবে, পিথাগোরাসই আবিষ্কার করেছিল। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা না। পিথাগোরাস কিন্তু পিথাগোরাসের উপপাদ্য আবিষ্কার করেননি। তিনি আবিষ্কারের বহু আগেই মানুষ এটা জানত। কিভাবে তিনি এটা আবিষ্কার করলেন, সেটা খুবই মজার একটা গল্প। সেই গল্পটাও আমি হয়তো বা এরপরের কোন একটা পর্বে বলার চেষ্টা করব।

আমার মনে সবসময় কিছু প্রশ্ন ছিল। অনেককিছুই আছে যেগুলো আমরা মনে করি আমরা জানি, কিন্তু আসলেই জানি কিনা, এটা আমরা জানি না! গণিত আমার কাছে কখনোই এরকম মনে হয় না, যে এটা কিছু setup rules, ধরাবাঁধা কিছু নিয়ম। কতগুলো নিয়ম আছে ধরে ধরে অঙ্ক করলেই হয়ে গেল। ব্যাপারটা মোটেই এরকম না। ম্যাথমেটিকসের

অধিকাংশ জিনিস অন্তর থেকে feel করা যায়, অনুভব করা যায়। এই যে অনুভব করা, এই যে feel করা, এই বিষয়টা নিয়ে আমার সবসময়কার একটা passion ছিল। যেমন, আমরা জানি যে ১ কে ০ দ্বারা ভাগ করলে সেটা হয় অসংজ্ঞায়িত। কিন্তু কেন? কেন আসলে এরকম হলো। ০ কে ০ দিয়ে ভাগ করলে আসলে কী হতে পারে? মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়, এটা একদম ছোটবেলা থেকে জানি। আমরা কি feel করি যে এটা কেন হয়? বা $4/3\pi r^3$ এটা হচ্ছে গোলকের আয়তন। কেন? গোলকের আয়তন কেন এরকম হয়? আমরা কি কোন elementary method দিয়ে, সহজ কোনভাবে একে ব্যাখ্যা করতে পারি? এরকম অসংখ্য প্রশ্ন সব সময়ই আমার মাথায় ঘুরপাক খেত। যেগুলো পরে আস্তে আস্তে জানার চেষ্টা করেছি এবং সেই বিষয়গুলোই আসলে আমি জানাতে চাই মানুষকে। আর তারজন্যই আসলে এই ভিডিওগুলোর অবতারণা।

যাই হোক, আমরা শেষ করব আরো একটি গল্প দিয়ে। অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকটা পর্ব অনেক গল্পে সাজানো থাকবে। কারণ ম্যাথমেটিকসের গল্পগুলো যদি না জানা যায়, তাহলে ভেতরের মজাটা আসলে পাওয়া যাবে না। একেকটা চিন্তা কিভাবে জন্ম নিল সেই গল্পগুলো অনেক সুন্দর হয়! কিছু ঘটনা আছে মজার, আবার কিছু ঘটনা আছে খুবই বিব্রতকর! আমরা ক্যালকুলাসের কথা অনেকেই জানি। ক্যালকুলাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেয়া হয় মূলত দু'জন মানুষকে– নিউটন এবং লিবনিজ। যখন প্রথম এই ক্যালকুলাসটা আবিষ্কৃত হলো তখন ম্যাথমেটিকসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় একটা দুর্যোগ, সবচেয়ে বড় একটা ঝগড়া লেগে গিয়েছিল। এবং এই ঝগড়া ছিল এই বড় দু'জন মানুষের মধ্যে। স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং লিবনিজ এই দু'জন মানুষের মধ্যে বিশাল কলহ বেঁধে গেল কে আগে আবিষ্কার করেছিল ক্যালকুলাস সেটা নিয়ে। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, কয়েকদিন পরেই রয়েল সোসাইটিতে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। ঠিক আছে, কে আগে আবিষ্কার করেছে তা নিয়ে তদন্ত করা হোক। মজার বিষয় হচ্ছে পদাধিকার বলে সেই তদন্ত কমিটির প্রধান ছিলেন নিউটন নিজেই। এবং নিউটন অনেক গবেষণা করে শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন– হ্যাঁ নিউটনই আগে আবিষ্কার করেছে! কী হাস্যকর একটা বিষয়! যাহোক এরকম অসংখ্য গল্প আমরা এর পরবর্তী পর্বগুলোতে বলব এবং feel করব কিছু ম্যাথমেটিকস।

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ২

কী নিষ্ঠুর!

এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে সংখ্যা। সংখ্যা হচ্ছে পৃথিবীতে আমার কাছে সবচেয়ে আদরের বস্তু, সবচেয়ে আদরের বিষয়। অবশ্য এটা আমার পৃথিবীতে! সংখ্যা নিয়ে বলতে গেলে আবারো যে মানুষটির কথা স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন পিথাগোরাস। আমার গুরু মহান পিথাগোরাস। সেই পিথাগোরাস, যিনি সবসময় সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করতেন, সবকিছুকেই সংখ্যার মতো করে দেখতেন। কিন্তু পিথাগোরাসের চরিত্রের একটা কালো অধ্যায় আছে। এখন আমি সেই গল্পটা বলব। তার আগে আমি বলে নেই, পিথাগোরাস মনে করতেন এই পৃথিবীতে সব সংখ্যাকেই পূর্ণসংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ দিয়ে বানানো যায়। কী রকম? ধরা যাক কেউ হয়তো বলল 1.3। গুরু বলবেন, 'এ আর এমন কী– 13/10'। আমরা জানি পূর্ণসংখ্যা যোগ, বিয়োগ আর গুণ করলে পূর্ণসংখ্যাই থাকে, যদি ঝামেলা হয়, তাহলে হতে পারে ভাগ নিয়ে। যদি কোন সংখ্যাকে দুটো পূর্ণসংখ্যার ভাগফল হিসাবে দেখানো যায়, তাদেরকে বলে **মূলদ সংখ্যা**। পিথাগোরাস মনে করতেন সব সংখ্যাই মূলদ। এই মনে করাতেই ঝামেলা ছিল। আসলে সবকিছুই মূলদ না। এখন আমরা জানি যে, যদি ২ এর বর্গমূল নেয়া যায় (অর্থাৎ root over 2)– এই সংখ্যাটাকে কখনই দুইটা পূর্ণসংখ্যার ভাগফল হিসাবে প্রকাশ করা যায় না। এটা একটা অমূলদ সংখ্যা। এই কথাটাই প্রথমে যিনি বলেছিলেন তিনি হলেন হিপ্পাসাস (Hippasus), পিথাগোরাসের একজন শীষ্য। একদিন তিনি এসে বললেন,

–'গুরু, ও গুরু, আপনি যে বলেছেন সবকিছুই যে মূলদ সংখ্যা এটা হলে তো আপনার উপপাদ্যটা ভুল!'

–'কী বলিস তুই! সারা জীবন এই একটাই উপপাদ্য দিলাম, এটাও ভুল হবে? কী বলিস তুই?'
–'না মানে দেখেন, আমি আপনাকে ঠিক ওভাবে বলিনি। মনে করেন এই যে সমকোণী ত্রিভুজে আপনি বলেছেন, অতিভুজ^2= লম্ব^2 + ভূমি^{2}। দেখেন যদি লম্ব হয় ১ এবং ভূমি হয় ১ তাহলে অতিভুজ^2= $1^2 + 1^2$। এখন অতিভূজ^2 = 2। সুতরাং অতিভুজ = $\sqrt{2}$ মানে অতিভুজ= ২ এর বর্গমূল। গুরু! এটা কিন্তু কখনোই পূর্ণসংখ্যার ভাগফল হিসেবে প্রকাশ করা যায় না'। এটা বলে হিপ্পাসাস দেখালেন, একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু এবং কর্ণ একইসাথে মূলদ হওয়া সম্ভব না। তারপর বললেন,
–'দেখলেন তো গুরু, এটা মূলদ সংখ্যা না!'
–'কি বললি তুই??'
–'গুরু এটাতো মূলদ সংখ্যা না'।
–'কি বললি???'

তখন কী করা হয় জানেন? হিপ্পাসাসকে মেরেই ফেলা হয়! পিথাগোরাস নিজের হাতে মারেননি। কিন্তু তার শিষ্যরা তার পরের দিনই তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের ভেতর জাহাজ থেকে ফেলে দিয়েছিল। এবং হিপ্পাসাস মারা যান। হিপ্পাসাসকে বলা যায় ম্যাথমেটিকসের ইতিহাসে প্রথম শহীদ! যিনি সংখ্যার জন্য জীবন দিয়ে দিয়েছিলেন। হিপ্পাসাসকে বলা হয় অমূলদ সংখ্যার আবিষ্কারক। তো হিপ্পাসাসের গল্প আমরা শুনলাম।

[লেখকের কথা: যখন ভিডিওটা করি, তখন জানতাম পিথাগোরাসের লোকেরা সত্যি সত্যি হিপ্পাসাসকে মেরে ফেলেছিল। এখন একটু বড় হয়েছি, লেখাপড়া একটু বেড়েছে, এখন জানি, হিপ্পাসাসের সময়টা ছিল পিথাগোরাসের ১০০ বছর পর! যে গল্পটা বললাম সেটা কিন্তু একেবারে আকাশ থেকে পাওয়া না, এটা গণিত মহলে বেশ পরিচিত। যতদূর জানা যায় হিপ্পাসাস জাহাজডুবিতে মারা গিয়েছিলেন, পিথাগোরাসের গোঁড়া ভক্তরা রটিয়ে দিয়েছিল– ও অমূলদ সংখ্যার মতো অপবিত্র জিনিস তৈরি করেছে, এইজন্যে দেবতারা রেগে গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে জাহাজ! তবে অমূলদ সংখ্যা আবিষ্কারের কৃতিত্ব এখনও হিপ্পাসাসকে দেয়া হয়।]

হিপ্পাসাস সাগরতলে ঘুমাক, আমরা সংখ্যার কথা বলি। পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় সংখ্যা হচ্ছে ১১। তো ১১ কেন প্রিয় সেটা বলতে পারব না। অনেক ভাল লাগে এজন্যই প্রিয়। (প্রিয় হওয়ার জন্য

কোন কারণ আসলে দরকার হয়না কখনো!) তবে এই ১১ এর কিছু বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। যেমন ১১ সংখ্যাটা খাঁটি বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে। এ ব্যাপারটা আসলে পৃথিবীর কোন ভাষায় সম্ভব না। এই যে আমি আজকে যতগুলো কথা বলছি সবকিছু হয় তো অনুবাদ করে ফেলা যাবে। কিন্তু এখন আমি এই মুহূর্তে যে কথটি বলব সেটা কখনোই অনুবাদ করা যাবে না। কারণ এটা শুধু বাংলাতেই সম্ভব! কিভাবে সে কথা বলতে পারে?

১ কে যদি আমরা ১১ দিয়ে ভাগ করি, কী পাব? এই যে ১ কে ১১ দিয়ে ভাগ করলাম। আচ্ছা, এটা কি কখনো শূন্য হবে। নিশ্চয়ই না। কারণ ভাগের উপরে শূন্য না থাকলে কখনো শূন্য হয় না। ১ কে ১১ দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাওয়া যায় সেটা একটু দেখি। ১ কে ১১ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায় ১/১১=০.০৯০৯০৯০৯০৯০৯০৯.... তকিয়ে দেখুন সে কিন্তু সত্যি কথা বলেছে। ১ কে ১১ দিয়ে ভাগ করলে শূন্য হয় না। সে ঠিক সেই কথাই বলছে। সে বলছে ১/১১ তে যেটা হয়– সেটা কিন্তু শূন্য নয় শূন্য নয় শূন্য নয়, সে সারা জীবন ধরে এমন করে বলতে থাকে। সে একটি সত্যবাদী সংখ্যা। এবার পরের সংখ্যাটিতে যাই।

২ কে যদি ১১ দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে কী পাওয়া যাবে? তখন পাওয়া যাবে বাংলা ভাষার সবচেয়ে লোভী সংখ্যা। কেন? দেখা যাক। ২ কে ১১ দ্বারা ভাগ করলে আসবে, ২/১১=০.১৮১৮১৮১৮১৮১৮১৮১৮... এখন পড়ুন এক আট এক আট এক আট...। এভাবে ধীরে ধীরে পড়লে এটা যে লোভী তা বোঝা যাবে না। সুতরাং একটু জোরে জোরে পড়ুন, দেখুন কী বলে, *এক আট-অ্যাকাট-অ্যাকা ট্যাকা, ট্যাকা, ট্যাকা, ট্যাকা, ট্যাকা...*। দেখেছেন কী বদমাশ! মাত্র ২/১১। ২, এইটুকু বয়সে এখানে এসে ট্যাকা, ট্যাকা করছে। এ জন্যই এটা হচ্ছে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে লোভী সংখ্যা।

এরকম কথা বলার সংখ্যা আরো আছে। যেমন ১১ কে যদি আমরা ৩০৩ দিয়ে গুণ করি তখন পাওয়া যাবে ৩৩৩৩। (১১×৩০৩=৩৩৩৩)। এই ৩৩৩৩ এটাকে নিচে রাখলাম আর উপরে থাকলো ১১২৩। এখন ১১২৩ কে যদি আমরা ৩৩৩৩ দিয়ে ভাগ করি তখন যে সংখ্যা পাওয়া যায় এটা হচ্ছে বাংলা ভাষার সবচেয়ে মিথ্যাবাদী সংখ্যা। কেন দেখা যাক ভাগ করলে ১১২৩/৩৩৩৩= .৩৩৬৯৩৩৬৯৩৩৬৯৩৩৬৯.... খেয়াল করুন। খেয়াল করুন ৩ আর ৩ কত হয়। ৩ আর ৩ হয় ৬। আমরা সারা

জীবন জেনেছি ৩ আর ৩ মিলে ৬ হয়। অথচ এই ব্যাটা বলে কিনা তিন তিন ছয় নয়, তিন তিন ছয় নয়, তিন তিন ছয় নয়! এটা একটা পাক্কা মিথ্যাবাদী। যাক ১১২৩ দিয়ে ৩৩৩৩ কে ভাগ করলে একটা মিথ্যাবাদী সংখ্যা পাওয়া যায়। [প্রিয় পাঠক, আপনিও কি এমন কথা বলা সংখ্যা খুঁজে বের করতে পারেন? পারলে আমাকে জানিয়ে দিয়েন!]

আমরা কথা বলার সংখ্যা দেখলাম। ১১ দিয়ে আরো মজার মজার জিনিস করা যায়। যেরকম ১১ দিয়ে গুণ করা খুব মজা। আমাকে যদি বলা হয় বলতো ৩৪×১১ কত হবে? মুখে মুখে ধুম করে বলে দিতে পারি ৩৭৪। ৪৫×১১ কত হয়? ৪৯৫। ৫২×১১ কত হবে? ৫৭২। কিভাবে হলো সেটা একটু বলি আপনারও পেরে যাবেন একবারেই। এটা খুবই একটা সহজ নিয়ম। আমি বলেছি ৩৪×১১=৩৭৪। দেখুন ৩৪ এর মধ্যে কি কি ছিল? ৩ আর ৪। এই ৩ আর ৪ কে দুই পাশে ছড়িয়ে ফেলুন এবং ৩ ও ৪ এর যোগফল ৭ কে মাঝে ঢুকিয়ে দিন। তাহলে কত হল? ৩৭৪। এটাই উত্তর। সব জায়গায় এটা সত্যি! যে রকম ৪৫×১১=৪৯৫। ৪ আর ৫ কে দু'পাশে ছড়িয়ে দিন এবং ৪ ও ৫ কে যোগ করলে হয় ৯। সুতরাং একে মাঝে বসিয়ে দিন। ব্যস! হয়ে গেল ৪৯৫। তবে এমন শর্টকাট কিছু শিখলে অবশ্যই নিজেকে প্রশ্ন করবেন কেন এমন হলো– কেন হলো সেটা না জানলে এটা কোন জ্ঞানই হবে না! যেমন এই যে নিয়মটা বললাম– এটা আসলে খুব সাধারণ একটা বিষয়। দেখুন ৪৫ কে যদি ১১ দিয়ে গুণ করতে হয়, তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ১ দিয়ে ৪৫ কে গুণ করব– হবে ৪৫। এভাবেই ডান দিকে একঘর ছেড়ে আবারো ৪৫। তাহলে কি হবে উপরের ডান দিক থেকে ৫ নেমে আসবে এবং বাঁ দিক থেকে ৪ নেমে আসবে, তারপর মাঝখানে ৪ ও ৫ মিলে ৯ বসে যাবে। সুতরাং হয়ে গেল ৪৯৫। এটাইতো হওয়ার কথা ছিল। তাই হয়েছে। আচ্ছা এবার চিন্তা করুন তো যদি দুইটার যোগফল ১০ এর থেকে বড় হয়ে যায়। কী রকম? ধরা যাক

```
  ৪৫
× ১১
-----
  ৪৫
 ৪৫×
-----
 ৪৯৫
```

```
  ৭৫
× ১১
-----
  ৭৫
 ৭৫×
-----
 ৮২৫
```

৭৫×১১= ৭ (১২) ৫ কি হয়? এখন ৭ আর ৫ আমরা দু পাশে সরিয়ে ফেললাম। তো ৭ আর ৫ এ হয় ১২। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মাঝখানে ঘর আছে একটা। তাহলে ৭ ও ৫ এ ১২ এর ২ রেখে দিলাম আমরা এবং পাশে যে ১ আছে তাকে ৭ এর সাথে যোগ করে দিলাম হয়ে গেল ৮। তো এভাবেই ৭৫ ×১১=৮২৫ হয়। এভাবে আমরা কোনো সংখ্যা খুব সহজে ১১ দিয়ে গুণ করে ফেলতে পারি। ১১ নিয়ে আজকের অংশটা এই পর্যন্তই। [চিন্তার কথা: গুণ করার নিয়মটা অমন কেন? কেন আমরা একটা ক্রসচিহ্ন দিয়ে বাম পাশে সরে যাই?] এখন আমরা যাব পাঁচের কাছে। পাঁচ নিয়ে বলার আগে একটা খেলার কথা একটু কল্পনা করা যাক। মনে করুন, বাংলাদেশ আর অস্ট্রেলিয়ার একটি one-day ক্রিকেট ম্যাচ। বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছে। ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভার শেষে কোনো উইকেট না হারিয়ে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৪৩২। বিশাল রান। আমরা একটা স্বপ্ন দেখছি, বাংলাদেশ জিতবে আজকে। অস্ট্রেলিয়া বুঝতেই পারছে যে আজ তাদের জেতার কোনো সম্ভবনাই নেই। তো ওই বেচারারা যখন জিততে পারবেই না তখন আসুন আমরা ওদের একটু required run rate এর হিসাব করে দেই। যদি বাংলাদেশ ৪৩২ রান করে, তাহলে জিততে হলে তাদের লাগবে ৪৩৩ রান। তো এখন required run rate টা কত হয়? আমরা জানি, মোট যে রানটা আছে তাকে আমরা মোট ওভার ৫০ দিয়ে ভাগ করলেই পেয়ে যাব required run rate। তবে এই যে ৫০ দিয়ে ভাগ করাটা এটা খুব দ্রুত মাথার মধ্যে করে ফেলা যায়। আমি সেটা একটু শিখিয়ে দেই আপনাদেরকে। এই যে ৪৩৩ তাকে আমরা ভাগ দিচ্ছি ৫০ দিয়ে। ৪৩৩ কে দ্বিগুণ করতে হবে, মানে ডাবল। ৪৩৩ তাকে ডাবল করলে হয় ৮৬৬। এখন এই ৮৬৬ এর শেষ থেকে (.) দশমিককে দুই ঘর বামে সরিয়ে নিন। তাহলে হয় ৮.৬৬। আর এটাই হচ্ছে required run rate। সবসময়ের জন্যই এটা সত্যি! বিশ্বাস হচ্ছে না? চলুন আরেকটা খেলা কল্পনা করি। মনে করুন, খেলা হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ

$$\frac{125}{50} = \frac{125 \times 2}{100} = \frac{250}{100} = 2.50$$

আফ্রিকার। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথমেই ব্যাট করতে নেমেছিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওরা ৫০ ওভার শেষে ১২৪ রান করেছে। তাহলে এখন বাংলাদেশের required run rate কত হবে? বাংলাদেশ এবারও জিতবে। দক্ষিণ আফ্রিকা করেছে ১২৪ রান। তাহলে বাংলাদেশের করতে হবে ১২৫। তাই ১২৫ কে আমাদের ৫০ দিয়ে ভাগ করতে হবে। তাহলে আমি কী বলেছিলাম? ১২৫ কে দ্বিগুণ করে ফেলুন। ১২৫ কে ডাবল করলে ২৫০। তাহলে এখন ডান দিক থেকে বামের দিকে দশমিক (.) দুই ঘর সরিয়ে ফেলুন। তাহলে কি হল? ২.৫০। তো এটাই হচ্ছে required run rate। আমরা মুখে মুখে এটা করে ফেলতে পারি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কেন এরকম কাজ করল। এমন কেন হলো এটা। কারণটা খুব সোজা আসলে। কারণ হচ্ছে এই যে আমরা যখন ৫০ দিয়ে কাউকে ভাগ করছি, আমরা আসলে ২ দিয়ে গুণ করে ১০০ দিয়ে ভাগ করছি!

৫০ দিয়ে ভাগ মানে
দ্বিগুণ করে ১০০ দিয়ে ভাগ!

আর ১০০ দিয়ে ভাগ করলেই তো দশমিকটা (.) দুই ঘর সরে আসে। এ কথাটাই আমি বলেছিলাম। আমরা এখন ৫০ দিয়ে ভাগ করার ব্যাপারটা জানি। ৫ দিয়ে গুণ করাটা এখন চিন্তা করতে পারি? একইরকম! তখন আমাদের ১০ দিয়ে গুণ করে ২ দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই যে ৫ দিয়ে গুণ করার ব্যাপারটা বললাম, এটা খুব সহজ নিয়ম, সব শর্টকাট ক্যালকুলেশনের বইয়ের ভেতরেই পাওয়া যায় নিয়মটা। আমি কিন্তু কোন বই পড়ে এটা শিখিনি! আমি কোত্থেকে শিখেছিলাম সে কথাটা আপনাদেরকে বলতে চাই। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি একজন রিকশাওয়ালার। হ্যাঁ, আমি আসলে এটা শিখেছি একজন রিকশাওয়ালার কাছ থেকে। আমার বাড়ি কুষ্টিয়াতে। তো কুষ্টিয়ার এক রিকশাওয়ালা– সে টাকা গুনছে আমি দেখছি। তার কাছে ১৪টা ৫টাকার নোট আছে। সে কিন্তু জানেনা পাঁচ চৌদ্দং সত্তুর (১৪×৫=৭০)। আমি দেখলাম সে গুনছে এভাবে, দুইটা দুইটা করে জোড়া বানাচ্ছে। কতগুলো জোড়া হলো তার কাছে? ১৪টা নোট থেকে ৭টা জোড়া হলো। পাঁচ টাকার নোটের একটা

জোড়ায় হয় ১০টাকা। ৭টা জোড়া আছে , তাহলে টাকা আছে ১০×৭=৭০। কী সহজে গুনে ফেলল ৭০টাকা। তাহলে তার আইডিয়াটা এরকম ছিল যে আগে সে জোড়া করল। তারপর সে আসলে ১০ গুণ করল। তখন আমার মাথায় আসলো আরে এটাতো খুব দারুণ একটা Idea। তাহলে আমাকে যদি কেউ বলে যে ২৪৪ কে ৫ দিয়ে গুণ কর। তখন আমি দেখবো যে ২৪৪ কে কতবার জোড়া করা যায়। জোড়া কতগুলো করা যাবে? ২৪৪ ভাগ ২টা মানে ১২২টা। এটাকে ১০ দিয়ে গুণ দিলেই হবে! ১২২ কে ১০ দিয়ে গুণ করলে (১২২×১০=১২২০) শেষে শুধুমাত্র একটা শূন্য থাকবে। এখন আমি মুখে মুখে ৫ দিয়ে গুণ করতে পারি। ২৪৪× ৫, হ্যাঁ, এটা ১২২০ হয়। এটাই শুধু না যদি আরো বড়ো হয় যে ৮৬৪৮×৫=কত? তাহলে ৮৬৪৮ কে আমরা অর্ধেক করে নেব। যেমন ৮৬৪৮ কে অর্ধেক ৪৩২৪ করব। এবং ৪৩২৪ এর শেষে একটা ০ যোগ করে দেব, তাহলেই গুণফলটা বের হয়ে যাবে। হবে ৪৩২৪০।

শেষ করব আমার কিছু কথা দিয়ে। এই যে আমি মাঝে মাঝে যখন ম্যাথের কথাগুলো বলছি। এই জিনিসগুলো আমার কাছে ম্যাথমেটিকসের জগতে ভ্রমণ করার মতো মনে হয়। মনে হচ্ছে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এখন আপনারা চিন্তা করুন, আমি আপনাদেরকে একটা ভ্রমণকাহিনি শোনাচ্ছি। আমি বলছি, আমি এমন এমন জায়গায় গিয়েছিলাম। আমি এই জায়গাগুলোর বর্ণনা আপনাদের দিচ্ছি। বর্ণনা শুনে হয়তো আপনারা খুশি হচ্ছেন। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন কি যে মানুষটা ভ্রমণকাহিনি শোনে আর যে নিজে ভ্রমণ করে তাদের মধ্যে কে বেশি আনন্দ পায়? নিঃসন্দেহে যে ভ্রমণ করে সে-ই বেশি আনন্দ পায়। তার আনন্দ অনেক বেশি। ম্যাথ নিয়ে ছোটবেলায় যখন এই চিন্তাগুলো করতাম, সে সময় যে আনন্দটা পেতাম, তার সাথে আসলে পৃথিবীর কোন কিছুই তুলনা হয় না আমার কাছে। আসলে নিজে ভ্রমণ করলে যে আনন্দটা পাওয়া যায় সেটার আনন্দ অনেক অনেক গুণ বেশি, ভ্রমণকাহিনি শোনার থেকে তো বটেই। আরেকটা ব্যাপার হলো; যেখানে যেতে চান, সেটার থেকে যাওয়ার রাস্তাটাই অনেক ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি সুন্দর হয়। এখানে যখন আমি আপনাদেরকে গল্প শোনাচ্ছি, সেই রাস্তাগুলোর কথা আমি কিন্তু আপনাদেরকে বলছি না। আমি শুধু ভ্রমণের কিছু বর্ণনা দিচ্ছি। রাস্তাটাও অনেক সুন্দর আসলে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করি– আপনারা নিজে ভ্রমণ

করুন। নিজে অনুভব করার চেষ্টা করুন। এটা অনেক জরুরি। শুধু আমার কাছ থেকে কিছু জিনিস শিখলেন, এটুকুতেই শেষ হয়ে গেল, এটা যেন কখনো না হয়! আপনারা ভ্রমণ করুন গণিতের দুনিয়ায়। আপনাদের ভ্রমণ শুভ হোক।

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ৩

হায়রে শূন্য!

পৃথিবীর এত সংখ্যাকে এত সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায়, শুধুমাত্র শূন্য দিয়ে কাউকে ভাগ করা যায় না। কেন? কী অন্যায় করেছিল আমার শূন্য? এই তো সেই শূন্য। যেটিকে প্রথম ব্যবহার করেছিল সেই ব্যাবিলনের মানুষ আজ থেকে প্রায় ২৭০০ বছর আগে। কিন্তু ওরা শূন্যকে সংখ্যার মর্যাদা দিতে জানেনি। (ব্যাবিলন কোথায়? ব্যাবিলন। ব্যাবিলন হচ্ছে বর্তমান ইরাকে, ঐ যে কারবালা প্রান্তরটা আছে না, সেখান থেকে ২৫ মাইল দূরে আর সাদ্দামের বাগদাদ থেকে মাত্র ৫৫ মাইল দূরে)। যাই হোক, ওরাতো সংখ্যার মর্যাদা দিতে পারেনি। আমার শূন্যকে যারা সংখ্যা মর্যাদা দিয়ে তিলে তিলে বড় করে তুলেছিল তারা হচ্ছেন আমাদের এই উপমহাদেশের গণিতবিদগণ। প্রথমে এই সংখ্যা নিয়ে কাজ করেছেন বলে জানা যায় তিনি হলেন 'আর্যভট্ট'। আর্যভট্টের একটি বই হচ্ছে 'আর্যভট্টম'। এখানে বলে রাখি, সেই সময়কার গণিতবিদগণ তাদের সমস্ত গণিতকে এখনকার মতো symbolic কায়দায় লিখে রাখতেন না। তারা লিখে রাখতেন কাব্যে কাব্যে, ছন্দে ছন্দে, আর পদে পদে। আর সেই আর্যভট্টের বইটির ৪টি ভাগ ছিল। (ক) গীতিকাপদ (খ) গণিতপদ (গ) কালক্রিয়াপদ ও (ঘ) গোলপদ। যাই হোক আর্যভট্ট ছন্দে ছন্দে লিখেছেন "স্থানম স্থানম দশ গুণম"। এর মানে হচ্ছে স্থানে স্থানে দশ ঘর করে গুণ হয়। আমরা এখন যে একক, দশক, শতক, সহস্র এগুলো করি অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গায় দশ দশ করে গুণ হয়ে হয়ে যায়, আসলে তিনি সেই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আর এর মাঝখানে নিঃসন্দেহে লুকিয়ে ছিল শূন্য (০)। কিন্তু হ্যাঁ ! এখানে শূন্য 'লুকিয়ে'ই ছিল। প্রথমবারের মতো আমাদের সামনে যিনি ০ কে সংখ্যা হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি হলেন 'ব্রহ্মগুপ্ত'। ব্রহ্মগুপ্তের একটা বিখ্যাত বই ছিল 'ব্রহ্মাস্ফূটসিদ্ধান্ত' যেটা ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে

প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ব্রহ্মাস্ফুটসিদ্ধান্ত বইটির মধ্যে প্রথমে শূন্যকে সংখ্যার মর্যাদা দিয়ে দেখানো হয়। শূন্য (০) দিয়ে কোন সংখ্যাকে গুণ, যোগ ও বিয়োগ করলে কী হয় সেই কথাগুলো সেখানে খুব সুন্দর করে বলে দেওয়া আছে এবং ঠিক ভাবে বলে দেওয়া আছে [ভাগ করলে কী হয়, সেটাও বলা ছিল, তবে ওটা ভুল ছিল]। এরপরে যারা শূন্য নিয়ে কাজ করেছেন তার মধ্যে ছিলেন মহাবীর এবং ভাস্কর। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কী হয় সেই ব্যাপারে নিশ্চিত করে, ঠিক করে কিছু বলে যেতে পারেননি। হায়রে শূন্য ! যুগে যুগে কত মানুষই-না এই শূন্য নিয়ে গবেষণা করে গেল। সেই ব্যাবিলনের মানুষ থেকে শুরু করে 'ব্রহ্মগুপ্ত'। "ব্রহ্মগুপ্ত" থেকে শুরু করে আজকের আইয়ুব বাচ্চু পর্যন্ত কতবার শূন্য নিয়ে ভেবেছেন। আইয়ুব বাচ্চু গেয়েছেন তার গানে 'শূন্যতায় ডুবে গেছি আমি। আমাকে তুমি ফিরিয়ে নাও'।

হ্যাঁ ! আজকে আমিও এই শূন্যতার মাঝে হারিয়ে গেছি। শূন্য দিয়ে একটা সংখ্যাকে ভাগ করলে কী হয় সেটা বোঝার আগে দেখে নেই শূন্য দিয়ে ভাগের ঝামেলাটা কোথায়। ঝামেলাটা বোঝার জন্য একটা কাজ করা যাক। মনে করি, $y=x$ এটা আমরা ধরে নিলাম। তাহলে আমি বলতে পারি $xy=x^2$। উভয়পক্ষে x গুণ করে। তাহলে বলা যায় $xy-y^2 = x^2-y^2$। বামপক্ষ থেকে এখন y কমন নেয়া যাক। তাহলে থাকবে $y(x-y)$, আর ডান পাশ থেকে ছেলেবেলার ফরমুলায় x^2-y^2 এর সূত্র করে নিলে থাকে $(x+y)(x-y)$। এখন দেখি দুই পাশে $(x-y)$। $(x-y)$এবং $(x-y)$ মুকাবালা।

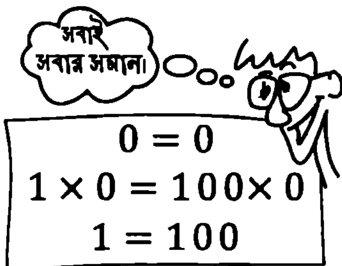
$$y = x$$
$$xy = x^2$$
$$xy - y^2 = x^2 - y^2$$
$$y(x-y) = (x+y)(x-y)$$
$$y = (x+y)$$
$$x = (x+x)$$
$$x = 2x$$
$$1 = 2$$
$$52 = 53$$



থাকলো $y=(x+y)$। এখন আমরা তো আগেই ধরে রেখেছিলাম $x=y$ পরস্পর সমান। তাহলে y এর মান আমরা x দিতে পারি। তাহলে পাচ্ছি $x=x+x$। অথবা $x=2x$। উভয়পক্ষ থেকে আবারো x, x মুকাবালা। থাকলো $1=2$। আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি ১ এবং ২ পরস্পর সমান। ব্যাপারটা কে আরো মজাদার করার জন্য উভয়পক্ষে আরো ৫১ করে যোগ করি। তাহলে আমরা পেয়ে যাব ১+৫২= ২+৫১ বা ৫২=৫৩। আমরা বাংলায় একটা প্রবাদ পড়েছি যে, 'যাহাই বাহান্ন তাহাই তেপান্ন'। এই নিন, Mathematically proved! আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি যে

বাহান্ন এবং তেপান্ন পরস্পর সমান। অর্থাৎ কারো কাছ থেকে ৫৩টাকা ধার নিয়ে ৫২টাকা ফেরত দেব!! কথা হচ্ছে, বিচারটা কি ঠিক হলো? হলো না। তার মানে এখানে ভুল হয়েছে। কোথায় ভুলটা হয়েছে? প্রথমবার আমরা যখন মুকাবালা করেছিলাম এই (x-y) এবং (x-y)। আসলে ঝামেলাটা তখনই হয়েছে। আমরা যখন ধরেই নিয়েছি x ও y পরস্পর সমান, এদের বিয়োগফল কিন্তু শূন্য। x=y, y কে বামপাশে নিয়ে গেলে x-y=0। অথচ আমরা কিন্তু দুই পাশে (x-y) কে কাটাকাটি করছি। x-y যেহেতু 0। আমরা আসলে 0 দিয়ে ভাগ করছি। 0 দিয়ে ভাগ করলে এই ধরনের উদ্ভট সমস্যা হতেই পারে। ব্যাপারটাকে আমরা আরো সহজ করে দেখানো যায়। 0 আর 0 কে যদি আমরা পরস্পর সমান ধরি। ধরার কী আছে, আমরাতো জানিই যে 0 আর 0 সমান। এখন একপাশে 0 সমান লিখলাম 1×0 আর অন্য পাশে 0 সমান 100×0। লেখাই যায়। এখন তাহলে দুই পাশকে 0 দিয়ে ভাগ করি। 0, 0 মুকাবালা। পেলাম 1 সমান সমান 100। এটা কি ঠিক হবে? হবে না। তার মানে, আসলে আমি 0 দিয়ে ভাগ করতে পারছি না।

এখন আসলে বোঝানো যাক যে 0 দিয়ে ভাগ করলে আসলে সমস্যাটা কি হয়। সেটা যদি আমরা feel করতে চাই তাহলে function নিয়ে একটু ভাবতে হবে। ফাংশন হলো একটা মেশিনের মতো, কিছু একটা দিলে, কিছু একটা পাওয়া যাবে। যেটা দেয়া হবে সেটা *input,* যা পাওয়া যাবে তাকে বলে *output*। ধরা যাক আমাদের কাছে একটা function আছে, যেটা দেখতে এমন f (x)= 1/x। এই মেশিনটার কাজ হচ্ছে, ও যাকে পায় তাকে ধরে উল্টে দেয়। মানে কি? 2 দিলে 1/2। 3 দিলে 1/3। 4 দিলে 1/4। এরকম

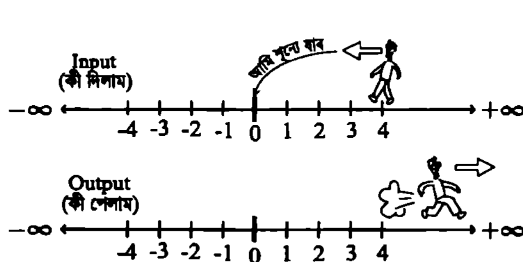


যাকে পায় তাকে ধরে উল্টে দেয়। এমনই ½ আমরা পাব 2। তাহলে আমি এই মেশিনের মধ্যে 0 দিয়ে দেখতে চাই যে কত আসে। 0 দিয়ে যদি এর মান আসে 1/0। তাহলে তো কাজের কাজ। এটা দেখার জন্য একটা কাজ করা যাক। আমরা দুইটা সংখ্যা রেখা চিন্তা করি। এখানে

দুইটা সংখ্যা রেখা আছে। দুইটা সংখ্যা রেখা। তো আমরা কেন দুইটা সংখ্যা রেখা দেব? কারণ হলো একটাতে আমরা Input দিবো আর অন্যটিতে Output দিবো। দেখবো যে আমরা কি দিলাম আর কি পেলাম। তো উপরের টাতে কি দিলাম আর নিচের টাতে কি পেলাম দেখা যাবে। এখন দেখা যাবে সংখ্যা রেখার মধ্যে কি আছে। সংখ্যা রেখার মধ্যে 0 আছে, এরপর 1, 2, 3, 4 এরকম করতে করতে একেবারে শেষ মাথায় কি আছে চিন্তা করুন তো। সংখ্যার তো আর কোন শেষ নেই, এর কোন সীমা নেই। শেষ মাথায় আছে আসলে অসীম। তো কোন অসীম? অসীম আবার দুইটা: একটা হচ্ছে প্লাস অসীম (+), আর অন্যটি হচ্ছে মাইনাস অসীম (-)।

যেহেতু 1, 2, 3, 4 এ দিকে positive direction এদিকে শেষ মাথায় আছে প্লাস অসীম আর ওদিকে শেষ মাথায় আছে মাইনাস অসীম। ঠিক একই জিনিস নিচেরটাতেও। এবার আমরা এক কাজ করি। এবার আমরা ঐ মেশিনের মধ্যে 4 দেই। যখন 4 দেব, পাবো কত? 1/4=0.25। এবার আমি দিলাম 3, তাহলে পাবো কত? 1/3=0.33। এবার আমি দিলাম 2, পাবো কত? 1/2=0.50। আমার আসলে ধান্ধাটা কি জানেন? আমি চাচ্ছি আস্তে আস্তে 0 তে যাব আমি। 4, 3, 2 এমন করে কমতে কমতে 0 তে যাব। আমি দেখতে চাই Output-টা কোথায় যায়। কারণ 0 তে কত হয় আসলে আমি সেটাই দেখতে চাই। এমন করে আমি যখন 4, 3, 2 দিচ্ছি। ভাল করে খেয়াল করে দেখুন আমি যতই বামে শূন্যের দিকে আগাচ্ছি আমার Output কিন্তু ততই বিপরীতদিকে মানে ডানদিকে সরে যাচ্ছে। এবারে আমি দিলাম 1, পেলাম 1/1=1। এখন আমি বামদিকে আগালাম, ও সরে গেল ঐ দিকে। আমি দিলাম (1/2) পাওয়া গেল 2। আমি দিলাম (1/3) পাওয়া গেল 3। আমি দিলাম 1/10 , পাওয়া গেল 10। আমি দিলাম 1/100 পাওয়া গেল 100, আমি দিলাম 1/10000000 পাওয়া গেল 10000000। দেখছেন আমি যতই বামদিকে 0'র কাছাকাছি আসছি, ও ততই দ্রুত ঐ ডানদিকে সরে যাচ্ছে। এমন করতে করতে করতে করতে আমি ঠিক যখন 0-তে পৌঁছাবো, ও তখন ওদিকে সরতে সরতে সরতে সরতে এই রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছাবে, আর এই রাস্তার শেষ মাথায় আছে 'প্লাস অসীম' (ধনাত্মক অসীম)। অর্থাৎ আমি যখন 0 তে পৌঁছাবো তখন এই মেশিন

আমাকে দেবে 'প্লাস অসীম'। সুতরাং আমি এই মেশিন থেকে চিন্তা করে বুঝে গেলাম 1/0 মানে হচ্ছে +অসীম। এই পর্যন্ত হলে কোন অসুবিধা ছিল না।



$f(0) = \frac{1}{0}$ = এত বড় যে বলে শেষ করা যাবে না
অর্থাৎ সংখ্যারেখার ডান দিকে রাস্তার শেষ মাথায়, ধনাত্মক অসীম ($+\infty$)

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$f(4) = \frac{1}{4} = 0.25$

$f(3) = \frac{1}{3} = 0.\dot{3}$

$f(2) = \frac{1}{2} = 0.5$

$f(1) = \frac{1}{1} = 1$

$f(0.5) = \frac{1}{0.5} = 2$

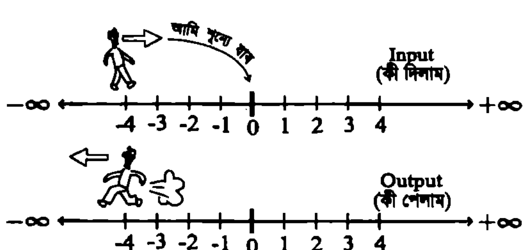
$f(0.25) = \frac{1}{0.25} = 4$

$f(0.1) = \frac{1}{0.1} = 10$

$f(0.01) = \frac{1}{0.01} = 100$

$f(0.00000001) = \frac{1}{0.0000001} = 10000000$

এখন সমস্যা হচ্ছে একজন গণিতবিদ বললেন, কেন তুমি শুধুমাত্র এইপাশ থেকে ৪,৩,২ করে 0'র দিকে আগালে। কেন তুমি অন্যদিক থেকে -4,-3,-2 করে আগালে না। তাইতো! ঠিক আছে। এবার ঐদিক থেকে আগানো যাক। মাইনাস (-4) দিলাম। মাইনাস (-4) দিলে পাওয়া যাবে -1/4। মাইনাস -3 দিলে -1/3। মাইনাস -2 দিলে -1/2। এবার খেয়াল করে দেখুন, আমি যতই ডানে 0'র দিকে আগাচ্ছি আমার Output কিন্তু ততই বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছে। এমন করতে করতে



$f(0) = \frac{1}{0}$ = এত ছোট যে বলে শেষ করা যাবে না
অর্থাৎ সংখ্যারেখার বাম দিকে রাস্তার শেষ মাথায়, ঋণাত্মক অসীম ($-\infty$)

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$f(-4) = \frac{1}{-4} = -0.25$

$f(-3) = \frac{1}{-3} = -0.\dot{3}$

$f(-2) = \frac{1}{-2} = -0.5$

$f(-1) = \frac{1}{-1} = -1$

$f(-0.5) = \frac{1}{-0.5} = -2$

$f(-0.25) = \frac{1}{-0.25} = -4$

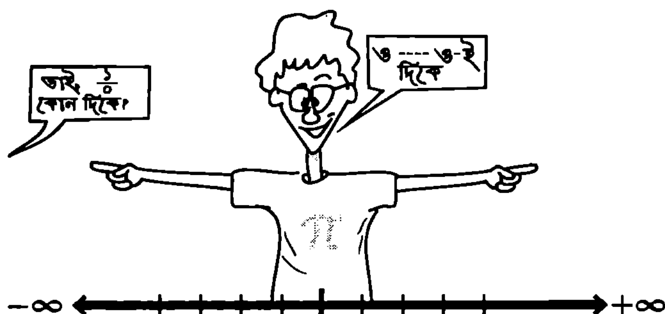
$f(-0.1) = \frac{1}{-0.1} = -10$

$f(-0.01) = \frac{1}{-0.01} = -100$

$f(-0.00000001) = \frac{1}{-0.0000001} = -10000000$

করতে করতে আমি যখন 0 তে গিয়ে পৌঁছাবো, ও তখন ঐদিকে সরতে সরতে সরতে সরতে এই রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছাবে, ঐদিকের শেষ

মাথায় আছে মাইনাস ইনফিনিটি। তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম 1/0 র' মান হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি।
ঝামেলা হয়ে গেল না? একটু আগে পেলাম প্লাস ইনফিনিটি, এখন আবার পেলাম মাইনাস ইনফিনিটি। তাহলে 1/0 এর মান মান কত? ধরুন একজন প্রশ্ন করছে, ভাই 1/0 টা কোন দিকে? আপনি একসাথে দুইদিকেই হাত মেলে দেখালেন ঐ......... দিকে।



এটাতো হলো না। আপনি এক 1/0 কে কয়দিকে দেখাবেন? এটাকে আসলে বলা হয় 'অসংজ্ঞায়িত'। কেন? একটা function কে কিংবা Operation কে সুসংজ্ঞায়িত তখনই বলা হয় যখন সেটা নিয়ে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 1/0 এর দুই রকম মান পাওয়া যাচ্ছে– প্লাস ইনফিনিটি এবং মাইনাস ইনফিনিটি। আসলে আমি তখন বলি যে 1/0 এর কোন মান নেই! তাহলে আমাদের যদি কেউ প্রশ্ন করে 1/0 কত? আমরা বলব– এটা আমরা বলতে পারি না!!!। ০ দিয়ে ভাগ করলে কী হয় সেটা ভাগের সংজ্ঞায় নেই। এটা অসংজ্ঞায়িত।

তবে হ্যাঁ, এই যে ধনাত্মক এবং ঋনাত্মক অসীম এরা হচ্ছে শূন্য দিয়ে ভাগের দুইটা সীমান্তিক মান বা Limiting Value । গণিতের একটা আলাদা বিষয়ই আছে লিমিট বা সীমা। সেখানে এই বিষয়গুলো ব্যবহার করা হয়। লিমিটের মজা হচ্ছে, ঠিক ০ তে পৌঁছালে কী হবে, সেটা নিয়ে লিমিট কাজ করে না। ০ এর 'কাছে' যেতে থাকলে, ফাংশন কোন 'দিকে' যাবে সেটার কথা বলে লিমিট। যেমন আমি যদি ধনাত্মক দিক থেকে কমতে কমতে 0 এর 'কাছে' যেতে থাকি, তাহলে 1/x প্লাস ইনফিনিটি এর 'দিকে' যাবে। আর যদি মাইনাস দিক থেকে বাড়তে বাড়তে আমি 0 এর কাছে আসি, 1/x আমি মাইনাস ইনফিনিটির 'দিকে' যাবে। আমি

কিন্তু বলছি না, ঠিক 0 তে এর মান কত হবে। 0 তে কত হবে, সেটা কেউ বলতে পারে না। আমি তখন বলছি, 1/0 এটা আসলে 'অসংজ্ঞায়িত' এর কোন মান নেই। একইভাবে 2/0, 3/0 ও 4/0 এমন সবাই "অসংজ্ঞায়িত"।

একটা ক্ষেত্রে শুধু একটু আলাদা ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে 0/0। এটাও অসংজ্ঞায়িত, তবে একটু স্পেশাল। শূন্যকে যদি শূন্য দিয়ে ভাগ করা যায় তখন কী হবে? এই ব্যাপারটা আরো মজার। একদল লোক বলবে কেন? উপরে 0 থাকলে আমরা জানি যে সবসময় 0 হয়। 0/1=0, 0/2=0, 0/3=0 তাহলে 0/0=হবে 0। আরেকদল বলল না, আপনি একটু আগে শিখিয়েছেন নিচে 0 থাকলে অসংজ্ঞায়িত হয়, আর Limiting Value থাকলে দুইটা প্লাস মাইনাস ইনফিনিটি। তাহলে এটাও হবে অসংজ্ঞায়িত আর প্লাস মাইনাস ইনফিনিটি হবে Limiting Value। আরেকদল বলল না, ব্যাপারটাকে এভাবে চিন্তা করুন। ভাগ ব্যাপারটা কী? ১৫ কে ৩ দিয়ে ভাগ করার মানে হচ্ছে ৩ এর সাথে কত গুণ করলে ১৫ হবে। কত গুণ করলে? ৫ গুণ করলে। তার মানে ১৫/৩=৫ । ১৬ কে ২ দিয়ে ভাগ করার মানে হচ্ছে ২ এর সাথে কত গুণ করলে ১৬ হয়। কত গুণ করলে ১৬ হয়? ৮ গুণ করলে। তার মানে ১৬/২=৮ । তাহলে 0/0 এর মানে হচ্ছে 0 এর সাথে কত গুণ করলে 0 হবে। 0 এর সাথে কত গুণ করলে 0 হয়? 1 গুণ করলেও 0 হয়, 2 গুণ করলেও হয়, 3 গুণ করলেও 0 হয়। তার মানে হচ্ছে এটার মান 2, 3, 4, 5 সবই হতে পারে। আরেক জন বলল অতকিছু আমি বুঝি না, উপরে 0 নিচে 0। 0,0 মোকাবেলা (কাটাকাটি)। তাহলে 0/0 এর মান হচ্ছে 1। এইবার ম্যাথমেটিশিয়ানরা ঝামেলায় পড়ে গেলেন, তাদের কাছে প্রশ্ন করা হলো, তাহলে আপনারাই বলুন 0/0 এর মান আসলে কত? তারা তখন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন আমরা 0/0'র মান জানি না, আমরা নির্ণয় করতে পারি না। নির্ণয় 'ন' জানি। তারা এটার নাম দিলেন 'অনির্ণেয়'। 0/0 কে বলা হয় 'অনির্ণেয় আকৃতি' (indeterminate form)। তাহলে 0/0 কি 'অসংজ্ঞায়িত'? উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই 'অসংজ্ঞায়িত'। কেন হবে না, কারণ এটাতো কনফিউশন তৈরি করছে আমাদের ভেতর। যারা এমন কনফিউশন তৈরি করে তারা সবাই 'অসংজ্ঞায়িত'। তাহলে কি 0/0 'অসংজ্ঞায়িত' আবার 'অনির্ণেয়'ও? অবশ্যই। আসলে যত রকম অনির্ণেয়

আকার আছে তারা প্রত্যেকেই অসংজ্ঞায়িত। অসংজ্ঞায়িত আকারগুলোর একটা স্পেশাল কেইস হচ্ছে 'অনির্ণেয়'। এরকম করে বলা যেতে পারে, আসলে–সকল অনির্ণেয় আকারই অসংজ্ঞায়িত কিন্তু সকল অসংজ্ঞায়িত আকারই অনির্ণেয় নয়।

তবে একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে মাঝে মাঝে Practical purpose এ মানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 1/0 এর মান শুধু ধনাত্মক অসীম ধরা হয়। কখন? যখন আমাদের একটা পাশ বন্ধ থাকে। ধরা যাক 'ভর' নিয়ে আমরা কাজ করছি। ভরের মান তো ঋনাত্মক হতে পারে না। তখন আমাদের সংখ্যা রেখার একটা অংশ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। আমরা তখন শুধুমাত্র ধনাত্মক দিক থেকে 0'র কাছে যাই। এমনভাবে গেলে, আমরা সবসময় প্লাস ইনফিনিটি এর দিকে পৌঁছাবো। এজন্য পদার্থবিজ্ঞানে, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এ ধরনের জায়গায় 1/0 মান মাঝে মাঝে ধনাত্মক অসীম ধরা যায়। শুধুমাত্র তখন, যখন আমরা নিশ্চিত যে এটার মান ঋণাত্মক হওয়া সম্ভব না।

তো শেষ করব আমার কিছু নিজের কথা দিয়ে। এই যে শূন্য এটার প্রথম সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়েছিল আমাদের এই উপমহাদেশে। সংখ্যা নিয়ে আমাদের এ উপমহাদেশে যে পরিমাণ কাজ হয়েছে সেটা আসলেই বিশাল, সেটা অনেক অনেক বড়। আমাদের এখানে এই 'স্থানীয় মান' পদ্ধতি নিয়ে কাজ হয়েছে, এই যে আমরা এখন একক, দশক, শতক এই জিনিসগুলো আমরা বলি, সারা পৃথিবীতে এই সিস্টেমটাই ব্যবহৃত হয়। অথচ আমরা আজকে আসলে গণিতে অনেক বেশি পিছিয়ে গেছি। কিন্তু আমরা চাইলেই পারি– এই উপমহাদেশেই জন্ম নিয়েছিলেন 'শ্রীনিবাস রামানুজন' এর মতো গণিতবিদ। আমরা চাইলেই আবারো আমাদের সেই হারানো ঐতিহ্যকে ফিরে পেতে পারি। আমার এই ভিডিওগুলো দেখে যদি একজন মানুষও গণিতে অনুপ্রাণিত হয় সেটা হবে আমার অনেক বড় পাওয়া। গণিতের প্রেমময় শুভেচ্ছা।

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ৪

৩টি মেয়ে!

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের একজন যাকে বলা হয় গণিতের রাজপুত্র– তিনি হচ্ছেন, জার্মান গণিতবিদ 'কার্ল ফ্রেডরিখ গাউস'। এই যে গাউস, তিনি ছোটবেলা থেকে গণিতে মারাত্মক রকম প্রতিভাধর ছিলেন। কী রকম? তখন তার বয়স মাত্র ৩ বছর। তার বাবা বসে বসে বিশাল লিস্ট ধরে যোগ করছেন। যেই যোগ করা শেষ, কোত্থেকে পিচ্চি গাউস এসে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'ও আব্বা, তুমি তো ভুল করেছ। ওটাতো এইটা হবে'। বাবা তখন হিসাব মিলিয়ে দেখে আসলে তাই তো! তার ছেলেটা কিভাবে বলল। চিন্তা করুন, তার বয়স মাত্র ৩ বছর। গাউস গণিত নিয়ে কী পরিমাণ পাগল ছিলেন সেটার কথা বলি। গাউসের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। তার সহকারী এসে তাকে খবর দিলেন, 'গাউস ভাই, আপনার স্ত্রী তো মৃত্যু শয্যায়, আপনি কি অঙ্কটা রেখে একটু স্ত্রীর কাছে যাবেন?' তখন গাউসের উত্তর ছিল, 'ভাই, ওকে আর কিছুক্ষণ একটু Wait করতে বলতে পারবা?' কী ভয়ঙ্কর চিন্তা! বলুন! তো গাউসকে নিয়ে সবচেয়ে বিখ্যাত যে গল্পটা সেটা হচ্ছে তার প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময়টা। তার একজন খুব কড়া টিচার ছিলেন 'মিস্টার বাটনার'। বাটনার সাহেব ক্লাসে ঢুকে দেখেন ছেলেপেলে অনেক চ্যাঁচামেচি করছে। তাই দেখে, ওদেরকে কাজ দিলেন, 'এই তোরা ১ থেকে শুরু করে ১০০ পর্যন্ত সবগুলো যোগ কর। ১ যোগ, ২ যোগ, ৩ যোগ, ৪ এমন করে করে সবগুলো যোগ করতে থাক। আমি একটু রেস্ট নিয়ে নেই'। তো নিয়ম ছিল যে, যার আগে হয়ে যাবে সে তার স্লেটটা এনে জমা দিয়ে দিবে। তো বাটনার সাহেবের কথা মুখ থেকে মাটিতেও পড়েনি তার আগেই গাউস তার স্লেট নিয়ে হাজির।

–'স্যার, এই যে, ৫০৫০'।

–'মানে! তুই কিভাবে পারলি?'
–'স্যার এটাতো খুব সোজা'
–'সোজা এটা? তো তুই এটা ব্যাখ্যা কর?'
–'স্যার এটাতো কোন ব্যাপারই না। মনে করেন ১+২+৩+ এমন করতে করতে ৯৮, ৯৯, ১০০ এগুলোর মধ্যেই তো যোগ করতে হবে, তাই না?
–'হ্যাঁ'।
–'দেখেন স্যার, আমি সামনের একটার সাথে পিছনের একটা নিয়ে নিয়ে যোগ করব। দেখেন, ১ আর ১০০ যোগ করলে কত হয়, ১০১। ২ আর ৯৯ যোগ করলে কত হয়, ১০১। ৩ আর ৯৮ যোগ করলে কত হয়, ১০১। এমন করে ৪ আর ৯৭ যোগ করলে ১০১। ৫ আর ৯৬ যোগ করলে ১০১। এমন করে করে কতগুলো জোড়া বানানো যাবে চিন্তা করেন। ১০০টা সংখ্যা আছে। তাহলে জোড়া বানানো যাবে ১০০/২ মানে ৫০টা। প্রত্যেকটা জোড়ার মানই হবে ১০১ করে। তাহলে যোগফল হবে ৫০×১০১। মানে ৫০৫০। স্যার, হয়ে গেছে'।

১+১০০=১০১
২+ ৯৯ =১০১
৩+ ৯৮ =১০১

১ + ২ + ৩ + · · · + ৯৮ + ৯৯ + ১০০

৫০ টা জোড়া, প্রতি জোড়ার মান ১০১ ।
মোট ৫০×১০১=৫০৫০

এই যে আইডিয়াটা ছিল সেটা এতটাই অসাধারণ ছিল যে এখন পর্যন্ত আমরা সেটা ব্যবহার করি। আমরা, এখন 1 থেকে n পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর যোগফল কী হবে সেটা বোঝার জন্য এই আইডিয়াটা ব্যবহার করতে পারি। ধরা যাক, 1+2+3+এমন করে করে যদি n পর্যন্ত যোগ করতে হবে। আমরা তখন আগের মতো চিন্তা করতে পারি। 1 আর n যোগ করলে হবে (n+1)। 2 আর n এর আগেরটা মানে (n-1) যোগ করলে হবে (n+1)। এমন করে, 3 আর (n-2) যোগ করলে হবে (n+1)। প্রত্যেকটাই হবে (n+1)। এমন করে কতগুলি (n+1) থাকবে? যেহেতু n সংখ্যক সংখ্যা আছে। তাহলে জোড়া বানানো যাবে n/2 টা। n/2 টা জোড়া, প্রত্যেকটা জোড়ার মান (n+1)। তাহলে আমরা যোগফল

পাচ্ছি (n/2)(n+1)। অর্থাৎ n(n+1)/2। এটাই হচ্ছে 1 থেকে n পর্যন্ত যোগফল।

$$1+n=n+1$$
$$2+(n-1)=n+1$$
$$3+(n-2)=n+1$$
$$1+2+3+\cdots+(n-2)+(n-1)+n$$

$n/2$ টা জোড়া, প্রতি জোড়ার মান $n+1$

মোট $(n/2)\times(n+1)=\dfrac{n(n+1)}{2}$

এটাকে এখন আমরা feel করতে পারি গাউসের আইডিয়া থেকে। [চিন্তার বিষয়: আচ্ছা,যদি n বিজোড় হয়, তখন কী হবে? সামনের 1 বা শেষের n কি সরিয়ে আলাদা করে নিয়ে জোড়া বানানো যাবে? পরে নাহয় আবার যোগ করে দেব!]

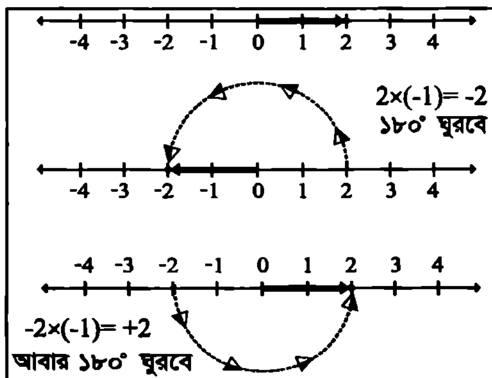
এই যে feel করা, এটা খুবই জরুরি একটা ব্যাপার। একটা জিনিস জানা আর অনুভব করা এই দুইটা একই কথা না। যেমন আমরা ছোটবেলা থেকে জানি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়। কেন! একটা পিচ্চিকে প্রশ্ন করেছিলাম। সে বলল, ভাইয়া, এটাতো খুব সোজা। এই যে একটা মাইনাস, এই যে একটা মাইনাস, এই মাইনাস্টা এইটার উপরে এসে উঠে বসে প্লাস হয়ে যায়।

একটি মাইনাস আরেকটি
মাইনাসের ঘাড়ে উঠিয়া প্লাস হয়

— — = +

আসলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা কিন্তু এ রকম না। তাহলে আসলে ব্যাপারটা কি রকম। আসলে মাইনাস বলতে কী বুঝায়। মাইনাস মাইনাস কী করলে প্লাস হয়? আসলে গুণ করলে প্লাস হয়। আরও ঠিক করে বললে, মাইনাস 1 আর মাইনাস 1 গুণ করলে প্লাস 1 হয়। কেন হয়? কোন সংখ্যাকে মাইনাস 1 দিয়ে গুণ করলে কী হয়? আমরা জানি, আমি যদি 10 কে

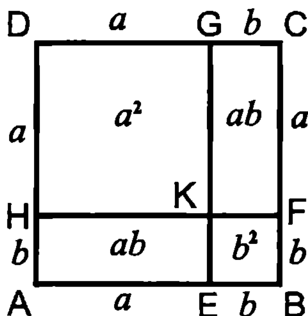
মাইনাস 1 দ্বারা গুণ করি, তাহলে হয় -10, এটা আসলে কী বোঝায়? আমি বললাম, আজকে আমি ব্যবসায় -100 টাকা লাভ করেছি। এটার মানে কী? মানে আমি আসলে 100 টাকা লস করেছি, ক্ষতি হয়েছে 100 টাকা। আমি বললাম, আজকে আমি উত্তর দিকে মাইনাস ১০ মিটার হেঁটেছি। এটার মানে হচ্ছে আমি আসলে দক্ষিণ দিকে ১০ মিটার হেঁটেছি। আরেকবার চিন্তা করুন, উত্তর দিকে মাইনাস ১০ মিটার বলা মানে দক্ষিণ দিকে যাওয়া। তাহলে মাইনাসের কাজ হচ্ছে আসলে সব কিছু উল্টে দেওয়া। আরো Mathematically চিন্তা করলে, মাইনাস আসলে কি করছে? ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আগে তো উত্তরে ছিলাম, এখন আমাকে সে কত ডিগ্রী ঘুরিয়ে দিল চিন্তা করুন তো! সে আমাকে ঘুরিয়ে দিল ১৮০ ডিগ্রি। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ১৮০ ডিগ্রি। এবং গাণিতিকভাবে, -1 দিয়ে কাউকে গুণ করার মানে হচ্ছে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া। এটা আরো ভাল করে বোঝা যাবে সংখ্যারেখা থেকে। ধরা যাক একটি সংখ্যারেখা আছে। এই সংখ্যারেখায় একটা সংখ্যা আছে 2। এই 2 কে যদি -1 দিয়ে গুণ করি তাহলে তো মাইনাস (-2) হবে। 2 কে যদি -1 দিয়ে গুণ করা যায় দেখুন সে আসলে ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে যায়। অর্থাৎ 2 থেকে মাইনাস (-2) তে চলে গেল ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে। তাহলে এই মাইনাস (-2) কে আবারো যদি -1 দিয়ে গুণ করি তাহলে কি হবে? আবারো সে ঘুরবে, মানে সে আবার আগের জায়গায় ফিরে যাবে প্লাস +2 তে। এজন্যই মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাচ্ছে। দুইবার ১৮০ ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে।



এরকম ছোটবেলা থেকে আমরা আরো একটা সূত্র বা formula খুব বেশি করে শিখি। $(a+b)^2$। এটাতো আমাদের খুবই আপন একটি সূত্র। আমরা আমাদের ছোটবেলা থেকেই শিখে এসেছি

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$। সারা জীবন মুখস্থ করে এসেছি। এই যে মুখস্ত ফরমুলাটা এটা কি আসলে feel করা যায়?। প্রাচীন গ্রীসের মানুষেরা কিন্তু feel করতে পারত। তারা কিভাবে feel করত সেটা বলি। তারা চিন্তা করতো বর্গক্ষেত্র দিয়ে। আমরা জানি, কোণ বর্গক্ষেত্রের একবাহুর দৈর্ঘ্য যদি হয় ৩, তাহলে ক্ষেত্রফল হবে ৩^২ মানে ৯। যদি বর্গক্ষেত্রের বাহু হয় x ,ক্ষেত্রফল হবে x^2। যদি বর্গক্ষেত্রের বাহু হয় (a+b)। তখন ক্ষেত্রফল কত হবে? $(a+b)^2$। এবার একটা বর্গক্ষেত্র ABCD আঁকি, যার AB=BC=CD=DA= (a+b)।

E, F, G আর H বিন্দুগুলো বাহুগুলোকে a আর b অংশে ভাগ করেছে। এখন ৪টা ছোট ছোট চতুর্ভুজ দেখা যাচ্ছে বর্গক্ষেত্রটার মধ্যে। এই ৪টা ভাগ খেয়াল করি। এখন এই যে বড় ভাগটা (DHKG) সেটার ক্ষেত্রফল কত? এটার চারিদিকে যেহেতু a, তাহলে এটার ক্ষেত্রফল a^2 । এই যে পিচ্চি অংশটা (BFKE) এটার ক্ষেত্রফল কত? এটা একটা পিচ্চি বর্গ যার বাহু b । এর ক্ষেত্রফল তাহলে b^2। এই যে উপরে ডানদিকে যে আয়তক্ষেত্র (KFCG) তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হলো a আর b। তাহলে ক্ষেত্রফল হবে ab। আবার বামপাশে নিচে যে আয়তক্ষেত্রটা তারও ক্ষেত্রফল ab। তাহলে ab কত বার পাওয়া গেল। এখানে দুইটা ab আছে মানে 2ab। তাহলে দেখুন $(a+b)^2$ এই বর্গের ভেতরে আছে একটা a^2, একটা b^2, আর দুইটা ab। $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ এটা আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কোন কিছু জানা, আর কোন কিছু দেখতে পাওয়া এক ব্যাপার না। দেখতে পাওয়ার মধ্যে অনেক বেশি আনন্দ আছে।



এবারে আরেকটা ব্যাপারের কথা বলি। আমরা সবসময় বলি কোন সংখ্যার পাওয়ার শূন্য হলে তার মান হয় ১ (আসলে এটা পুরোপুরি সত্যি না, শূন্য এর পাওয়ার শূন্য হলে তার মান কত হয় কেউ জানে না, এটা একটা অনির্ণেয় আকার)। পাওয়ার শূন্য হলে মান ১ কেন হয়? এটার মানেটা কী? এটা জানার আগে পাওয়ার বা সূচক ব্যাপারটা একবার দেখে

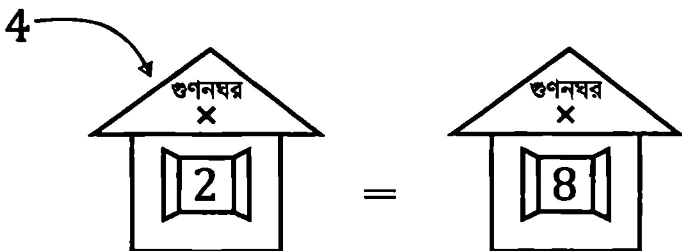
নিই। সূচক বিষয়টা কী রকম? 2 to the power of 3 মানে হচ্ছে $2\times2\times2$। মানে 3 বার 2 কে গুণ করা হয়েছে। 2^4 মানে হচ্ছে 4 বার 2 কে গুণ করা হয়েছে। তাহলে 2^0 মানে কি? কোন ২-কেই গুণ করা হয়নি। মানে কোন ২ নেই। এটার গুণফল কত? খুবই অদ্ভুত একটা ব্যাপার। এই জিনিসটাকে ম্যাথমেটিকসে বলে Empty product বা null product। [বাংলা করলে হবে শূন্যতার গুণফল]। তো যাই হোক, এই যে কোন ২ নেই। তাহলে এটার গুণফলটা আসলে কত হবে। এটাকে সহজ একভাবে চিন্তা করা যায় ভাগের ধারণা থেকে। ধরা যাক আমাদের কাছে 2^5 আছে অর্থাৎ ৫টা ২ গুণ আকারে আছে। এটাকে 2^3 দিয়ে ভাগ করতে চাই। এখন উপরের এই ৫টা ২ কে আমি যদি আমি নিচের ৩টা ২ দিয়ে ভাগ করি, তাহলে নিচের ৩টা ২, উপরের ৩টা ২ এর সাথে কাটাকাটি হয়ে যাবে। থাকবে উপরে মাত্র ২টা ২। অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে যে, উপরে ৫টা ছিল, তার মধ্যে ৩টাকে সে নিষ্ক্রিয় করে দিল। থাকল দুইটা।

$$\frac{2^5}{2^3} = 2^{5-3} = 2^2$$

$$\frac{2\times2\times2\times2\times2}{2\times2\times2} = 2\times2$$

এবার দেখা যাক 2^0 কে কিভাবে চিন্তা করা যায়। পাওয়ার শূন্য মানে হলো, যতগুলো ২ উপরে ছিল ততগুলোই আসলে আমাকে ভাগ করতে হয়েছে। ফলে সবগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে আর কিছুই নাই। ধরা যাক 2^0 কে আমি লিখলাম 2^{3-3} বা $2^3/2^3$। $2^3/2^3$ মানে হচ্ছে, উপরে আছে ৩টা ২ গুণ আকারে আর নিচেও আছে ৩টা ২, গুণ আকারে। তাহলে উপরে আর নিচে যদি একই জিনিস থাকে, ভাগ করলে পাব 1। তার মানে $2^0=1$।

এটা একটা ব্যাখ্যা। কিন্তু এটার থেকে সুন্দর করে ব্যাপারটাকে চিন্তা করা যায়। সরাসরি Empty product এর ধারণা থেকে। ধরা যাক, আমাদের কাছে একটা ঘর আছে। এই ঘরটা হচ্ছে গুণের ঘর। পৃথিবীতে যত গুণ চিহ্ন আছে সব কিছু তুলে আমি এই গুণনঘরে নিয়ে এসেছি। এর মানে কী, কেউ যদি আমাকে বলে ভাই, 3×4 কত হয়? আমি বলব, 'দাঁড়াও এই ঘর থেকে ঘুরে আসি'। এই ঘরের বাইরে আর কোথাও কোন গুণ নাই, 3×4-ও নাই। তাহলে এই ঘরটা নিয়েই এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই ঘরটা কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝাই।



এই ঘরটার একটা জানালা আছে। এই জানালার ভেতরে কিছু একটা সংখ্যা থাকে। আমি যদি বাইরে থেকে পেছনের দরজা দিয়ে কোন কিছু এই ঘরের মধ্যে ঢুকাই, তাহলে এই জানালাতে গুণফলটা দেখা যায়। তার মানে এই ঘরটা গুণ করতে পারে। কী রকম? যদি এই ঘরে আগে থাকে 2। আমি 4 কে এনে দিলাম। জানালায় দেখাবে 8। আমি এখন যদি 3 কে এনে দেই, জানালায় দেখাবে 24। আমি যদি 2 কে এনে দেই, এরকম ভাবে 48 এভাবে দেখাতে থাকবে। এখন কথা হচ্ছে, কেন, সবসময় আগে থেকে কিছু একটা থাকতে হবে কেন। কারণ গুণ জিনিসটা আসলে সবসময় দুই জনকে নিয়ে হয়। 3 গুণ 4। 5 গুণ 6। এটাকে বলে বাইনারি অপারেশন (Binary Operation)। দু'জন না হলে গুণ হয় না। এজন্য আগে থেকে একজনকে থাকতে হবে, একজন আসবে। এখন কথা হচ্ছে এই ঘরের সাহায্যে আমি যদি এখন 3×4 এটার হিসাব করতে চাই। আমি কিভাবে হিসাব করব। হ্যাঁ, ঘরে 3 ছিল, আমি 4 এনে দিলাম। দাঁড়ান। সবসময় কি আগে এ ঘরে 3 ই থাকবে? একদম শুরুর কথাটা চিন্তা করুন। একেবারে শুরুতে, যখন কোন গুণের কাজ শুরু হয়নি, তখন এই ঘরে কত থাকতে হবে? যেহেতু কিছুই শুরু হয়নি, তাহলে এই গুণ অংকের গুণের ঘরে কি 0 থাকবে? আচ্ছা 0 কে রাখলাম। যেহেতু কেউ নাই এই ঘরে, 0 আছে। এবার আমি ৩ কে নিয়ে আসলাম। 3 কে আনলাম। ভেতরে ঢুকে সে হয়ে গেল 0, কারণ 3×0=0। এবার 4 কে নিয়ে আসলাম। 4 ও ভেতরে 0'র সাথে মিলে আবারো 0। অতএব 3 আর 4 এর গুণফল শূন্য। এটা কি ঠিক হলো? হয়নি। যদি এ ঘরে আগে থেকেই 5 থাকতো, তাহলে আমি 3 কে নিয়ে এলাম, তিন পাঁচে পনেরো, 15। এবার 4 কে আনলাম 4 ও 15 এ 60। তাহলে পেলাম 3 ও 4 এ 60। এটাও কি ঠিক হলো? হলো না। তাহলে এই গুণ অংককে যদি ঠিক হতে

হয় আগে থেকে আমাকে কত থাকতেই হবে? সেটা হচ্ছে 1। একদম শুরুতে, যখন কেউ নেই এই গুণের ঘরে, তখন থাকতে হবে 1 কে। যদি 1 থাকে, তাহলে আমি 3 কে আনলাম পেলাম 3, 4 কে আনলাম 12। তার মানে 3 ও 4 এ 12। তার মানে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গুণফলটা ঠিক হচ্ছে। অর্থাৎ গুণফল ঠিক হবে, যদি একেবারে শুরুতে, যখন গুণের ঘরে কেউই নেই, তখন যদি 1 থাকে। এটাই Empty product, $2^0=1$। অর্থাৎ যখন কোন 2 নেই, গুণফল কত হবে, 1। যখন কোন 5 নেই, গুণফল কত হবে, 1। পৃথিবী^{0} কত? 1। সবকিছুরই power 0 হলে 1 হবে। তবে সাবধান!!! যদি 0^0 হয়, এবং ইনফিনিটি^{0} হয়, তখন কত হবে এটা আমরা বলতে পারি না। কারণ এটা একটা অনির্ণেয় আকার।

যাই হোক, এই ছিল মোটামুটি আজকের feel এর অংশগুলো। আজকের পর্বটা আমরা শেষ করব একটা সমস্যা দিয়ে। আমার খুব প্রিয় একটা সমস্যা। একজন মহিলার ৩ টি মেয়ে ছিল। একদিন তার বাসায় গেলেন একজন আদমশুমারীকার। মানে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোক গণনা করে বেড়ান, তথ্য যোগাড় করে বেড়ান, এরকম একজন লোক। তিনি মহিলার বাড়ি গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন। ঠক!ঠক!ঠক। মহিলা দরজা খুলে দিলেন। লোকটা বলল, আপা, আপনার বাসায় কে কে আছে, এবং তাদের বয়সটা একটু আমাকে বলবেন। তখন মহিলা বলল, আমার তিন মেয়ে। তিন মেয়ের বয়সের গুণফল ৩৬। মহিলা ছিল ম্যাথমেটিশিয়ান, তার কথা শুনেতো লোকটার মাথা খারাপ। 'হায় হায়!! এরকম তো কখনো শুনি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম বয়স। আর উনি বলে গুণফল ৩৬'। লোকটারও গণিত নিয়ে আগ্রহ ছিল। সে বলল, 'আপা, আপা, গুণফল তো অনেকভাবেই ৩৬ হতে পারে, প্লিজ আরেক টা Clue দিন!' এবার মহিলা দ্বিতীয় clue-টা দিলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, আমি যদি আপনাকে ওদের ৩ জনের বয়সের যোগফল বলে দেই, আপনি তাহলেও বের করতে পারবেন না'। এটা কি বললেন আপা, যদি যোগফল বললেও বের করতে না পারি তাহলে একথাটা বলার কি দরকার ছিল খালি খালি! মহিলা বললেন, 'না, এটাই একটা Clue যে, আমি যদি আপনাকে যোগফল বলেও দেই, তাহলেও আপনি বের করতে পারবেন না!' লোকটা হতাশ হয়ে বলল, 'আপা, তাহলে ভাল কিছু একটা বলুন। অন্ততপক্ষে

একটা ভাল Clue দেন'। মহিলা তখন বললেন সবচেয়ে অদ্ভুত কথাটা– 'আমার সবচেয়ে বড় যে মেয়েটা, সে কুকুর পুষতে পছন্দ করে!' 'কি!!!'

মজার ব্যাপার হচ্ছে, এটা শুনে আদমশুমারিকারী এবার সত্যি সত্যি বের করে ফেললেন ৩টা মেয়ের বয়স কত। [৩টাই আমরা পূর্ণসংখ্যা দিয়ে চিন্তা করি]। আপনাদের এখন কাজ হচ্ছে এই ৩টা বয়স হিসাব করে চিন্তা করা। যদি কেউ আগে থেকেই সমস্যাটা জানেন তাদের জন্য বলছি– তারা ৩৬ এর জায়গায় ৭২ নিয়ে চিন্তা করে দেখবেন। এটাও খুব মজার সমস্যা। এবং আপনারা এটাও চিন্তা করবেন ৩৬ ও ৭২ ছাড়া আর কী কী সংখ্যার জন্য এমন সমস্যা তৈরি করা যায়।

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ৫

মাথায় চুল কয়টি

বলুন দেখি মানুষের মাথায় চুলের সংখ্যা কত? আমি Exact সংখ্যাটা বলতে বলছিনা। তবে একটা অনুমান চাইছি। আমরা আমাদের আজকের পর্বে এরকম কিছু অনুমান নিয়ে কাজ করব আসলে। তো বলে ফেলি যে মানুষের মাথায়, যাদের মাথায় কালো চুল আছে– তাদের মাথার চুলের সংখ্যা মোটামুটি ১ লক্ষ ৮ হাজারের মতো। ১ লক্ষ ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার এরকম রেঞ্জের। যাদের মাথায় লাল চুল, তাদের কিছুটা কম থাকে– ৮০ হাজারের মতো। আর যাদের সোনালী চুল, তাদের থাকে মোটামুটি ১ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো। এই যে তথ্যটা, এই তথ্য থেকে বলে দেওয়া যায় যে, ঢাকা শহরে যত মানুষ আছে তার মধ্যে অন্ততপক্ষে ৮০ জন মানুষ পাওয়া যাবেই, যাদের মাথায় চুলের সংখ্যা exactly same। এটা অবশ্য খুব সোজা করেই প্রমাণ করা যায়, যাদের মাথায় টাক আছে মানে টাক মাথা যাদের এরকম তো ৮০ জন মানুষ পাওয়া যাবেই প্রত্যেকের মাথায় ০ টি করে চুল আছে। তাহলে তো সমান হয়েই গেল। যাই হোক এটা ছাড়াও যদি ধনাত্মক চুল বিশিষ্ট মানুষের কথাও ধরা যায়। যাদের মাথায় ০ থেকেও বেশি চুল আছে তাদের জন্যও এ কথাটা আসলে সত্যি। [চিন্তাসূত্র: যারা প্রমাণটা চিন্তা করতে চান, তাদের জন্য জন্য জানিয়ে দিই, এটা প্রমাণের জন্য কবুতর খোপ নীতি মানে pigeon hole principle লাগবে! আগ্রহী মানুষেরা এবার নিজ দায়িত্বে খুঁজে নিন।]

এখন আমাদের এই যে দেশ, বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশের ২০১১-১২ সালের বাজেট অনুসারে কত টাকা আমাদের রাজস্ব Income হওয়ার কথা। এটা হচ্ছে ১, ১৮, ৩৮৫ কোটি টাকার মতো। তো এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সারা বছরের Income। আর "'বিল গেটস্"– তার

সম্পদের পরিমাণ হচ্ছে মোটামুটি ৪, ৭২, ০০০ কোটি টাকার মতো। যা বাংলাদেশের সারা বছরের Income এর ৪ গুণ। তো এই টাকাটা কত? এটা অনুমান করার চেষ্টা করি আমরা। আমার হিসাব মতে এটা হচ্ছে এ রকম– আমরা যদি ২০ ফুট×২০ ফুট×১০ ফুট একটা ঘর চিন্তা করি (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা)– এমন ঘর মোটামুটি ১৭৩টার মতো লাগবে, যদি আমি ১টাকার কয়েন দিয়ে ঘরগুলো ভরার চেষ্টা করি! [এটা যখন লিখছি, তখন এক টাকার মুদ্রা বাজার থেকে উঠিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে]

তার থেকেও অনেক বড় সংখ্যার কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। কী রকম? এই সারা পৃথিবীতে বালুর সংখ্যা কত? এই যে পৃথিবীতে যত সমুদ্র-সৈকত আছে, তাতে কী পরিমাণ বালু আছে। সেটা কি মাপা যায়? বিজ্ঞানীরা এটাও মোটামুটি মেপে ফেলেছেন। একটা অনুমান করতে পেরেছেন। এর অনুমানটা হচ্ছে মোটামুটি ৭.৫১০^{১৮} । মানে হচ্ছে ৭৫ হাজার কোটি কোটি টা। মানে হচ্ছে ৭৫ হাজার কোটি কোটিটা বালু কণা এ পৃথিবীতে আছে। [চিন্তাসূত্র: কিভাবে মাপা যাবে? একটা ১ সেন্টিমিটার রেখার উপরে কতগুলো বালুকণা আঁটে সেটা গোনা যায়। ওখান থেকে ১ বর্গসেন্টিমিটার এলাকায় কতগুলো আঁটে মাপা যেতে পারে। সারা পৃথিবীর সমুদ্রসৈকতগুলোর আয়তন স্যাটেলাইটের সাহায্যে মেপে ফেলা গেছে, সেটা ইন্টারনেটে খুঁজলে পাওয়া যাওয়ার কথা।] আচ্ছা মহাবিশ্বের তারার সংখ্যা কি রকম? এটা কি বালুকণার চাইতে বেশি? হ্যাঁ, এটা আসলেই বেশি। এটার রেঞ্জ মোটামুটি 10^{22} থেকে 10^{24} এর মধ্যে। মানে হচ্ছে ১ এর পরে আমি যদি মোটামুটি ২২টা শূন্য বসাই তাহলে যতগুলো হবে ততগুলো তারা হতে পারে। পৃথিবীতে অণুর সংখ্যা কত? মানে যত যত কিছু আছে সবকিছু মিলিয়ে কতগুলো অণুর হতে পারে। এটার মোটামুটি মাপ হচ্ছে 1.33×10^{50} এর মতো। অর্থাৎ ১ এর পরে যদি ৫০টা ০ বসানো যায়। আসলে এভাবে না বলে, বলা যায় যে ১৩৩ এর পরে আমরা যদি ৪৮টা শূন্য দিয়ে যাই তাহলে যত বড় একটা সংখ্যা হবে তাহলে ততগুলো হচ্ছে এই পৃথিবীতে অণুর সংখ্যা! 10^{50} আসলে অনেক বড় একটি সংখ্যা।

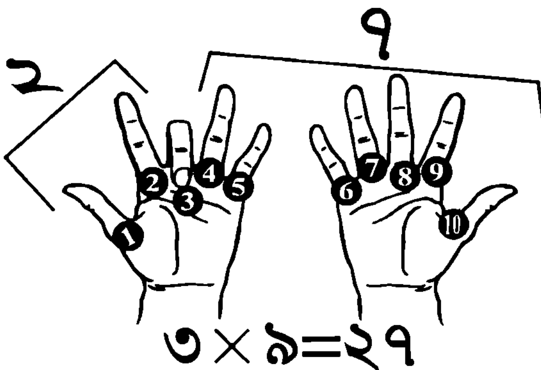
একটা সংখ্যা আছে যাকে বলে গুগল। 10^{100} হচ্ছে ১ গুগল। [এই গুগোলের ইংরেজি বানান হলো Googol, সার্চ ইঞ্জিন Google এর

থেকে একটু আলাদা। মজার কথা হলো বিশ্বখ্যাত Google এর প্রতিষ্ঠাতারা কোম্পানির নাম Googol-ই রাখতে চেয়েছিলেন, বানান ভুল করে Google রেখে ফেলেছেন!। এক গুগল (10^{100}) কত বড়? এটা এতই বড় যে এই পৃথিবীর কোন কিছু দিয়েই সেটাকে আসলে মাপা যাবে না। আমি যদি সারা পৃথিবীতে, সারা মহাবিশ্বের প্রতিটা অণু-পরমাণুকে গোনা শুরু করি, তাহলেও সেটা 10^{100} এর সমান হবে না। চিন্তা করে দেখুন, ১ এর পরে মাত্র ১০০টা সংখ্যা আমরা যদি লিখে ফেলি, এটা আসলে এত বড় একটা সংখ্যা হয়ে যাবে যে যার সমান কোন কিছুই আমাদের পাশে নেই।

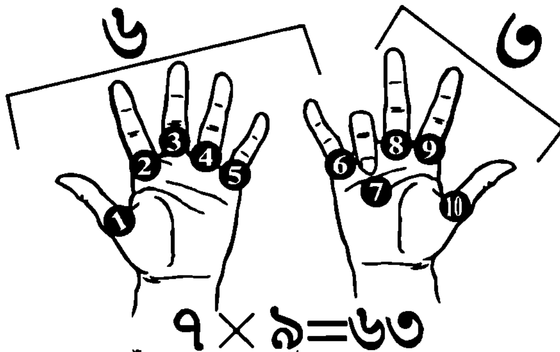
এখন আরো কিছু অনুমানের কথা আমরা চিন্তা করি। যেমন আমরা প্রায়ই বলি, এক ইঞ্চি, দুই ইঞ্চি, তিন ইঞ্চি। এক ইঞ্চি কতটুক সবারই ধারণা আছে একটু। আমি এভাবে মনে রাখি যে, আমাদের হাতের মাঝখানের আঙুলটার দুই করের মাঝ খানের যে অংশটুকু এটাই হচ্ছে মোটামুটি ১ ইঞ্চি! আপনি দেখবেন আপনার হাতেরও এ অংশটুকু মোটামুটি এক ইঞ্চির মতোই। তাই বলে ঐ যে একটা বাচ্চা শিশু, যে সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে তার হাতের আঙুল দিয়ে আবার চিন্তা করবেন না! যাহোক হাতের আঙুলের কথা যখন চলেই এল তখন অন্য একটা প্রসঙ্গ বলেই ফেলি। আবার আমরা আগের জায়গায় ফিরে আসবো।



হাতের আঙুল দিয়ে খুব সহজে নামতা শেখানো যায়। ৯ ঘরের নামতা। কিভাবে? দুটো হাত দশ আঙুল ছড়িয়ে মুখের সামনে ধরলাম। পরপর দশটা আঙুলকে এক থেকে দশ পর্যন্ত নাম দিলাম। ৩×৯ কত হয়? তখন ৩ নম্বর আঙুলটা আমি বন্ধ করব। ৩ নম্বর আঙুলটা বন্ধ করলাম।



দেখুন তিন নং সাতাশ, দেখা যাচ্ছে। কোথায়? সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। বন্ধ আঙুলটার এই পাশে আছে ২টা আঙুল আর ঐপাশে আছে ৭ টি– দুই, সাত মানে ২৭। আবার দেখেন ৭×৯ কত হয়?



৭ নম্বর আঙুল ভাঁজ করলাম। এই যে ভাঙ্গা আঙুলের একপাশে ৬, আর অন্যপাশে আছে ৩। তার মানে ৬৩ । এভাবেই ৯ ঘরের নামতা করা যায়। [প্রিয় পাঠক/ পাঠিকা, আপনি যেহেতু এই বইটি পড়ছেন, আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে, আপনি ৯ এর ঘরের নামতা জানেন! এটা বাচ্চাদেরকে শেখাতে ব্যবহার করতে পারেন! তাছাড়া চেনা জিনিস নতুন করে দেখতেও তো মজা, তাই না?]

[এক টুকরো চিন্তা: কেন এভাবে করলে ৯ এর নামতার সাথে মিলে যায়? দেখুন তো– ১৮ এর ১ আর ৮, ২৭ এর ২ আর ৭, ৩৬ এর ৩ আর ৬– নিজেদের মধ্যে যোগ করলে কোন মজার কিছু চোখে পড়ে?]

এখন আরেকটা জিনিসের কথা আমরা বলি। ১ মিটার কতটুকু। আমরা প্রায়ই বলি– ১ মিটার, ১ মিটার। কতটুকু হলে ১ মিটার হয়। আমি

চিন্তা করি যে, মাটি থেকে আমার কোমর পর্যন্ত ১ মিটার। আমার উচ্চতা হলো ১.৭২ মিটার। কোমর পর্যন্ত এক মিটার অনুমানটা খারাপ না। অন্যভাবেও ভাবা যায়, দুইহাত কাঁধ বরাবর বিস্তৃত করি। ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ রাখি। বাম কাধেঁর জয়েন্ট থেকে শুরু করে ডান হাতের মুষ্টি পর্যন্ত প্রায় ১ মিটার হয়। তো এক মিটার যদি আমরা জানি, তাহলে ১ বর্গমিটার কতটুক সেটা সর্ম্পকে আমাদের ধারণা করা যাবে এটাকে বাহু ধরে একটা বর্গ তৈরি করলেই। এক মিটারের কথা বলতে গিয়ে এইচএসসির বলবিদ্যা বইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। সেখানে গতিবিদ্যার একটা অংক ছিল– একটা বন্দুক সেটার নল হচ্ছে ১০ মিটার লম্বা। দাঁড়ান!!! একটু বোঝার চেষ্টা করি। ১০ মিটার লম্বা মানে আপনি ধারণা করতে পারছেন? ঘরবাড়িতে ১ তলা হয় মোটামুটি ৩ মিটার। ১০ মিটার মানে হচ্ছে মোটামুটি ৩ তলার সমান। ১টা বন্দুকের নলই যদি হয় ৩ তলার সমান। সে বন্দুকটা দিয়ে ঠিক আঙুল দিয়ে গুলি করা যাবে না, ট্রিগার চাপতে গেলে পুরো বাহু মনে ঢুকিয়ে দিতে হতে হবে! বুঝতেই পারছেন এটা একটি ভয়াবহ ব্যাপার। অংকের তথ্য যে বাস্তবসম্মত না, এটা উপলব্ধি করা যায়। যাহোক আমরা এমন করে তো ১০ মিটারটা বুঝতে পারলাম।

আপনারা বলের কথা জানেন। ফুটবল না, আমি পদার্থবিজ্ঞানে force মানে যেই বল, সেই বলের কথা বলছি। আমরা জানি, এই যে Force বা বল, তার একক হচ্ছে 'নিউটন'। এখন এক নিউটন কতটুকু বল? আমি যদি এরকম করে এই জায়গাটায় একটা ঘুষি মারি, এটা কত 'নিউটন' ছিল? সেটা কি আমরা অনুমান করতে পারি? এক নিউটনের সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম– এক কেজি ভরের কোন বস্তুর উপরে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে এটি ১ মিটার/সেকেন্ড² (ms^{-2}) ত্বরণপ্রাপ্ত হয় তাকে বলে ১ নিউটন। এই কথাটা দিয়ে ১ নিউটন সর্ম্পকে ধারণা করাটা আসলে খুব সহজ না। এটা দিয়ে আসলে feel করা যায় না ১ নিউটন কতটুকু। তার চেয়ে খুব সহজ একটা উপায় বলি। আপনাদের বাড়িতে দেখবেন গুঁড়া মসলা আছে। ঐ যে রাধুঁনী গুড়া মসলা [অন্য ব্র্যান্ড হলেও হবে]। ১০০ গ্রাম গুড়া মসঁলার প্যাকেট নিন। এই প্যাকেটটা হাতে ধরবেন। হাতে ধরলে যে পরিমাণ ওজন আপনি অনুভব করবেন, সেটাই মোটামুটি ১ নিউটন। ১০০ গ্রাম মানে হচ্ছে 0.1 kg। আর ওজন মানে W=mg। g এর মান হচ্ছে 9.8ms-2। ওখান থেকে হিসাব করলে পাওয়া যায়,W=0.98 N, তার মানে ১০০ গ্রাম গুড়া মসলার ওজন

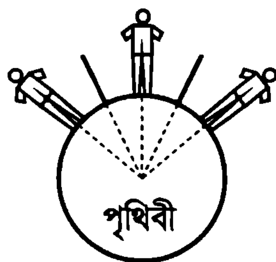
0.98 N যা প্রায় ১ নিউটন। আর যদি মন খুঁতখুঁত করে, exactly এক নিউটন বানাতে চান তাহলে আর দুই একটা গুঁড়া নিয়ে নিতে পারেন, exactly এক নিউটন হয়ে যাবে। ১ নিউটন সর্ম্পকে আমাদের তো এখন ধারণা আছে। এইটা খুব অল্প বল আসলে। আপনি যদি ঘুষি মারেন, সেটা নিঃসন্দেহে ১ নিউটন থেকে বেশি।

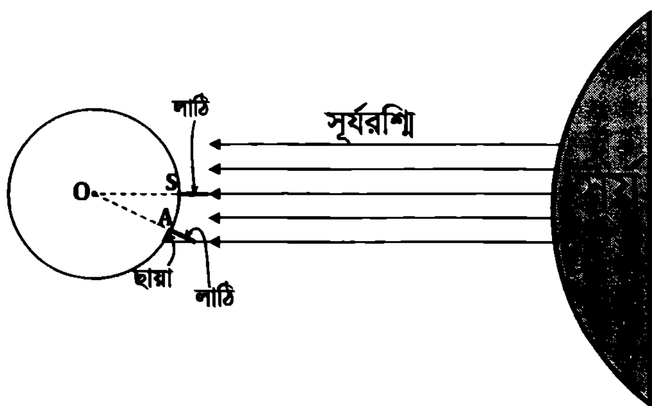
আচ্ছা ১ প্যাসকেল (pascal) চাপ কতটুকু হবে? ১ মিটার কতটুকু সেটা আপনারা এখন জানেন। সেটা থেকে বর্গ বানিয়ে ১ বর্গমিটার কাগজের পাত চিন্তা করুন। এই এক বর্গমিটার কাগজের উপরে ঐযে ১০০ গ্রাম গুড়া মসঁলা, সেটা আমরা সমান পরিমাণে ছড়িয়ে দিলাম। এত বড় জায়গাটার ভেতরে ১০০ গ্রাম গুড়া মসলা সমান ভাবে ছড়িয়ে দিলাম। এখন এই কাগজটা মসলার বি-শা-ল ওজনের কারণে নিচের দিকে যে পরিমাণ প্রচণ্ড চাপ অনুভব করবে এটাই আসলে ১ প্যাসকেল চাপ। বুঝতেই পারছেন এটা আসলে খুবই ছোট্ট একটা চাপ। ১ বর্গ মিটার জায়গার উপরে যদি ১ নিউটন পরিমাণ বল করা হয় সেটাই হচ্ছে ১ pascal চাপ। তাহলে আমরা ১ pascal চাপ সর্ম্পকেও মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছি।

তো এই অনুমান নিয়ে সবচেয়ে যে ব্যাপারটা আমার বেশি অবাক লাগে, সেটা হচ্ছে আজ থেকে প্রায় ২২০০ বছর আগে 'ইরাটোস্থেনিস' নামের একজন বিজ্ঞানীর অনুমান। তিনি সারা পৃথিবীর পরিধি প্রায় নিখুঁতভাবে বের করে ফেলতে পেরেছিলেন। অত বছর আগে কিভাবে তিনি এটা পারলেন? তার আগে বলে নেই, তিনি কোথায় থাকতেন। তিনি থাকতেন মিশরের 'আলেকজান্দ্রিয়াতে'। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত একটা লাইব্রেরি ছিল। তিনি ছিলেন সেই লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। এই লাইব্রেরিটা কী পরিমাণ অসাধারণ ছিল সেটা নিয়ে আরো একদিন বলা হবে। আমি শুধু একটা পর্ব রাখতে চাই এই লাইব্রেরির উপরে। তো সেই লাইব্রেরিতে বসে ইরাটোস্থেনিস একদিন পড়ছেন। পড়তে পড়তে দেখলেন, মিশরে একটা শহর আছে যার নাম সাইন (Syene)। [এটাকে এখন আসোয়ান (aswan) শহর বলে] সেই শহরে বছরের একটা নির্দিষ্ট দিনে (এখনকার হিসেবে ২১ শে জুনে) সূর্যটা মধ্য-দুপুরের সময় খাড়া মাথার উপরে থাকে। কী রকম? একটা লাঠি খাড়াভাবে মাটিতে পুঁতে রাখলে তার ছায়া দেখা যায় না। এমনকি কুয়াতেও যদি মানুষ মুখ দেয় তাহলে কুয়ার ভেতরে সূর্য দেখা যায় না। মানে মানুষের মাথার কারণে

মাঝের দিকে সূর্যটা দেখা যায় না, এতটাই খাড়া মাথার উপরে থাকে। এটা পড়ে তার ব্যাপারটা তার কাছে খুব Interesting লাগলো– বাহ্!! এটা তো খুব ভালো একটা ব্যাপার। তো তিনিও অপেক্ষা করে আছেন, যে বছরের ঐ সময়টাতে তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে বসেই পরীক্ষাটা করে দেখবেন। বছরের ঐ দিন তিনি যখন আলেকজান্দ্রিয়াতে এরকম একটা লাঠি পুঁতলেন, তিনি দেখলেন আলেকজান্দ্রিয়াতে ঠিকই লাঠির ছায়া দেখা যাচ্ছে। তিনি খুবই অবাক হলেন! কী ব্যাপার, এসময় তো ছায়া দেখা যাওয়ার কথা না। সাইন নগরীতে ছায়া পড়ছে না, এখানে কেন ছায়া পড়ছে? তিনি অনেক চিন্তা করে একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন। ব্যাপারটাকে এভাবে চিন্তা করা যেতে পারে। পৃথিবীটাকে তিনি ধরে নিলেন গোলক টাইপের।

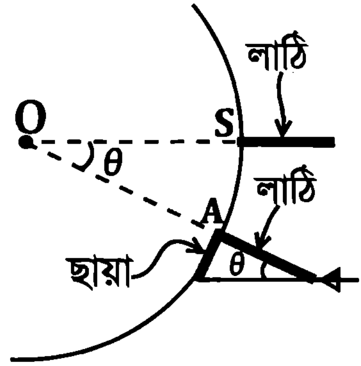
পৃথিবীর কোন জায়গায় যদি কোন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, যেখানেই থাকুক তাদের পা বরাবর আস্তে আস্তে যেতে থাকলে আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছবো। খাড়া একটা লাঠি পুঁতে সেটা বরাবর মাটির ভেতরে যেতে থাকলেও একসময় কেন্দ্রেই পৌঁছাবো। ইরাটোস্থিনিস চিন্তা করলেন এই ছবিটার মতো করে।





ধরা যাক মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার নাম a,আর সাইনের নাম S। তিনি

ভাবলেন, সূর্যটা তো অনেক বড়। সূর্য থেকে আলোগুলো এরকম সরাসরি সমান্তরালে আসতে থাকবে। ২১ শে জুনের কথা ভাবি। সাইন শহরে (S বিন্দুতে) সূর্যের আলো মানে সূর্যরশ্মি সরাসরি এসে লাঠিতে পড়বে, তাই এখানে কোন ছায়া পড়েনি। কিন্তু চিন্তা করুন সাইনে ছায়া না পড়লে যে আলেকজান্দ্রিয়ায় (A বিন্দুতে) ছায়া পড়বেনা তা কিন্তু না। দেখুন, আলেকজান্দ্রিয়ায় যদি ঠিক একই দিনে চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে, এই ছোট্ট একটু অংশে কিন্তু ঠিকই ছায়া পড়ছে। তিনি আরও একটা জিনিস খেয়াল করলেন। সেটা বুঝতে চলুন ঐ জায়গাটা ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস মানে আতশী কাচ দিয়ে একটু বড়ো করে দেখি। একটু বড় করে এখানে আকঁলাম।



লাঠিগুলোকে আস্তে আস্তে পেছন দিকে বাড়াই, তাহলে সেটাও কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়েই মিশবে। তিনি তখন চিন্তা করলেন যে আচ্ছা, দুইটা সমান্তরাল রেখার ক্ষেত্রে একান্তর কোণগুলো তো পরস্পর সমান হয়। তাহলে, পৃথিবীর কেন্দ্রের কোণ θ আর আলেকজান্দ্রিয়ার লাঠি আর সূর্যরশ্মির মাঝের কোণ θ তো সমান হবে। তার মানে আমি যদি লাঠি আর রশ্মির মাঝখানের কোণটা মাপতে পারি, তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণটা আছে সেটা আমি মেপে ফেলতে পারব। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, কেন্দ্রের কোণটা হচ্ছে মোটামুটি একটা বৃত্তের ৫০ ভাগের ১ ভাগ। একটা পুরো বৃত্ত কেন্দ্রে কোণ তৈরি করে ৩৬০ ডিগ্রি। তারই ৫০ ভাগের ১ ভাগ পাওয়া গেল কেন্দ্রের কোণ $\angle SOA$ বা θ।

ইরাটোস্থিনিস আগে থেকে জানতেন আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সাইন এর দূরত্ব কত (অর্থাৎ ছবিতে দেখানো aS চাপের দৈর্ঘ্য তার জানা ছিল)। এখন যেমন আমরা মাইল, কিলোমিটারে দূরত্ব মাপি, সেই সময় মানুষ দূরত্ব মাপত 'স্টেডিয়া (stadia)'র এককে। তিনি দেখলেন যে এটুকু (আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সাইন এর দূরত্ব) হচ্ছে ৫০০০ স্টেডিয়া। তিনি এবার ভাবলেন যে আচ্ছা, তাহলে ঐকিক নিয়ম দিয়েই আমি চিন্তা করি।

বৃত্তের ৫০ ভাগের ১ ভাগ কোণের জন্য দূরত্ব হয় ৫০০০ স্টেডিয়া। অতএব পুরো বৃত্তটার জন্য দূরত্ব হবে ৫০০০×৫০=২৫০০০০ স্টেডিয়া। এটাই হচ্ছে সারা পৃথিবীর পরিধি। আর এই স্টেডিয়া কে যদি আমরা এখনকার কিলোমিটারে প্রকাশ করি তাহলে এই দূরত্বটার মান বের হয় মোটামুটি ৩৯৬৯০ কিলোমিটার। এটাই পুরো পৃথিবীর পরিধি! এখনকার যে হিসাবটা আমরা জানি, সে দিক থেকে তার ভুলটা ২ শতাংশেরও কম ছিল! এতটাই ভাল ছিল তার হিসাব। দেখুন, শুধু এতটুকু একটা জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে তিনি সারা পৃথিবীর পরিধি প্রায় নিখুঁত ভাবে মেপে ফেলতে পেরেছিলেন। কী অসাধারণ একটা ব্যাপার!

যাই হোক, আমাদের আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই। আমরা গত দিন শেষ করেছিলাম একটা সমস্যা দিয়ে। তিনটা মেয়ের সমস্যা। না, আমি আজকেও সেটার উত্তর বলব না। আজকে বরং আরো একটা সমস্যা দিয়ে দেই। তো আজকের সমস্যাটা যত না গাণিতিক তার চেয়ে বেশি যুক্তির। খুব সহজ সমস্যা। আপনি দেখতে পেলেন আপনার সামনে দুইটি রাস্তা। একটা সুখনগরের রাস্তা আর অন্যটা দুঃখনগরের রাস্তা। তার সামনে দুইজন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তো আপনি এতটুকু জানেন যে, এদের মধ্যে একজন সবসময় সত্যি কথা বলে। আর আরেকজন সবসময় মিথ্যা কথা বলে। আপনি যেতে চান সুখ নগরে। এদেরকে আপনি ঠিক একটা প্রশ্ন করতে পারবেন। যে কোন একজনকে যে কোন একটা প্রশ্ন করতে হবে আপনাকে। এই একটা প্রশ্ন করেই আপনাকে বের করে ফেলতে হবে যে সুখনগরের রাস্তা কোন দিকে। এই প্রশ্নটা কী হবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

ভাল থাকবেন। আমরা আগামী পর্বে শুধুমাত্র কিছু সমস্যা নিয়েই আলোচনা করব। এই যে ৩টা মেয়ের সমস্যা সেটার সমাধান কী রকম হবে, আর আজকের সমস্যাটার সমাধান কী রকম হবে তা নিয়ে আলোচনা করব। এবং আরো কিছু অদ্ভুত সমস্যা, সেগুলোর সমাধান কী ধরনের হতে পারে সেই ব্যাপারগুলো আমরা দেখব আগামী পর্বে।

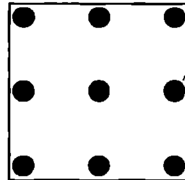
গণিতের রঙ্গে: পর্ব ৬

মিস্টার বাটা

ছোট বেলায় একবার এক কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রশ্ন এসেছে যে বাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?ঐ যে বিখ্যাত জুতার কোম্পানি বাটা, সেই বাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? আমি উত্তর জানি না। একটু বুদ্ধি করে উত্তর লিখে দিলাম, বাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার নাম "মি. বাটা"। ওমা পরে দেখি উত্তর সঠিক। ওনার নাম আসলে থমাস বাটা ছিল। তখন থেকে আমার মাথায় একটা ধারণা আসলো যে প্রচলিত জিনিসগুলোর বাইরে গিয়ে কোন কিছু চিন্তা করা– এটা আসলে খারাপ না। এই জিনিসটা কে Mathematically বলে Thinking outside the Box। এই 'Thinking outside the Box' নামটা যে গাণিতিক সমস্যার থেকে এসেছে সেটার কথা একটু বলি।

মনে করুন আপনার কাছে ৯টা বিন্দু আছে। তিনটা সারি, প্রতি সারিতে তিনটা করে, এভাবে ৯টা বিন্দু আছে । যেটা করতে হবে, যে ৪টা সরল রেখা দিয়ে এই বিন্দুগুলোকে যুক্ত করতে হবে। কিন্তু কলম তোলা যাবে না, এটা হচ্ছে শর্ত। ৪টা সরলরেখা দিয়ে এটাকে অনেক ভাবে যুক্ত করা যায়। যেমন পাশের থেকে এবং কোণার থেকে আমি ৪টা সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করে ফেললাম। আমি এটাকে যুক্ত করেছি ঠিকই কিন্তু আমাকে কলম তুলতে হয়েছে। কলম তোলা যাবে না। তাহলে কি ভাবে করা সম্ভব? হ্যাঁ, কলম না তুলেও এটা করা সম্ভব। এই সমস্যাটার উত্তর কখনোই আপনি বের করতে পারবেন না, যদি

চারটি সরলরেখা টেনে
সবগুলো বিন্দু যোগ করতে হবে।
কলম তোলা যাবে না!





আপনি এই চারকোণার এই জায়গাটুকু থেকে বারবার রেখা টানার চেষ্টা করেন। এই এতটুকুর মধ্যে থাকলে, কখনোই এটার উত্তর বের করা যাবে না। ঠিক উত্তরটা আমি এখন বলি। এটার আসল উত্তরটা হচ্ছে এ রকম। আপনাকে যেকোন একটা কোনা থেকে শুরু করে কর্ণ বরাবর অন্য কোনায় পৌঁছতে হবে, এবার ঐ সারি (বা কলাম) বরাবর শেষ মাথায় গিয়ে খানিকটা বের হয়ে ছবির মতো করে ঘুরে আসতে হবে। খেয়াল করুন আমরা আমাদের চারকোনা থেকে কিন্তু বের হয়ে গেছি, এবং ওটা না করলে এই সমস্যা সমধান করা যেত না। এজন্যই এটাকে বলে Thinking outside the Box। ঠিক একই ভাবে ১৬টা বিন্দুকে ৬ সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করা যায়। সেটা আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

বাক্সের বাইরে ভাবুন!

এ পর্যায়ে আমি গত দু'পর্বে যে সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করি। প্রথম সমস্যাটা এরকম ছিল যে, ৩টা মেয়ের বয়সের কথা বলা আছে। ৩টা তথ্য দেওয়া আছে। ৩টা তথ্য দিয়ে ৩ জনের বয়স বের করতে হবে। ১ম তথ্য ছিল এরকম যে ৩ জনের বয়সের গুণফল ছিল ৩৬। ২য় তথ্য ছিল এরকম যে, আমি যদি যোগফল বলেও দেই তাহলেও আপনি বের করতে পারবেন না। এবং ৩য় তথ্যটা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক, বড় মেয়েটা কুকুর পছন্দ করে। এই ৩টা তথ্য থেকে তাদের বয়সগুলো কিভাবে বের করে দেওয়া সম্ভব? একটু করে আগাই।

১) প্রথম তথ্যটা কি বলে যে তাদের বয়সের গুণফল ৩৬ । ১ম কাজ হচ্ছে Make your hands dirty। ইচ্ছা মতো ঘর নোংরা করুন, হাত নোংরা করুন। যত রকম কাহিনি এখানে হতে পারে, সবগুলো বের করার চেষ্টা করুন। কত ভাবে ৩টা সংখ্যার গুণফল ৩৬ হতে পারে। (১, ১, ৩৬) গুণ করলে ৩৬ হয়। (১, ২, ১৮) গুণ করলে ৩৬ হয়। (১, ৩, ১২) গুণ করলে ৩৬ হয়। এমন আছে (১, ৪, ৯) , আছে (১, ৬, ৬), আরো আছে (২, ২, ৯), (২, ৩, ৬) এবং ৩, ৩, ৪ । এত ভাবে ৩ সংখ্যার গুণফল ৩৬ হতে পারে। তার মানে আমাদের উত্তরগুলো কিন্তু এই কয়েক রকম case এর ভেতরেই একটা হবে। এখানে অসীম সংখ্যক case কিন্তু নেই, মাত্র ৮টা case আছে। তার মানে এই ৮টার মধ্যেই যে কোন একটা হবে।

২) এখন ২য় তথ্যটা ছিল– এই আমি যদি যোগফল বলেও দেই তাহলেও আপনি বের করতে পারবেন না। কেন, কি আছে সে যোগফলে? চলুন, একটু বের করে দেখার চেষ্টা করি। ১, ১, ৩৬ যোগ করলে হয় ৩৮। ১, ২, ১৮ যোগ করলে হয় ২১। ১, ৩, ১২যোগ করলে হয় ১৬। ১, ৪, ৯ যোগ করলে হয় ১৪। ১, ৬, ৬ যোগ করলে হয় ১৩। ২, ২, ৯ যোগ করলে হয় ১৩। ২, ৩, ৬ যোগ করলে হয় ১১। ৩, ৩, ৪ যোগ করলে হয় ১০। সবগুলোর তো যোগফল আমরা বের করে ফেলেছি। এখন আমি যদি আপনাকে বলে দেই ঐ ৩টা মেয়ের বয়সের যোগফল ১০। আপনি কি উত্তর বলে দিতে পারবেন? পারবেন আসলে। দেখুন যোগফল ১০ শুধু একভাবেই হতে পারে, যখন বয়সগুলো হয় ৩, ৩, ৪। আমি যদি বলে দেই যোগফল ৩৮। তখনও কি আপনি উত্তর বলে দিতে পারেন। হ্যাঁ, পারেন। ১, ১, ৩৬ – তখন এটাই হবে ৩টা মেয়ের বয়স। এইবার, আমি যদি আপনাকে বলি যোগফল ১৩। তাহলে কী হবে? চিন্তা করুন ১, ৬, ৬ যোগ করলেও ১৩ হয়। আর ২, ২, ৯ যোগ করলেও ১৩ হয়। আপনি কিন্তু এবার confusion এ মানে দ্বিধায় পড়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ ১৩ হচ্ছে সেই যোগফল, *যেই যোগফল বলে দিলেও আপনি উত্তর বের করতে পারছেন না*। তার মানে এই যে দুইটা case এদের মধ্যেই একটা হবে আসল উত্তর। ১, ৬, ৬ অথবা ২, ২, ৯।

	যোগফল
১,১,৩৬	৩৮
১,২,১৮	২১
১,৩,১২	১৬
১,৪,৯	১৪
১,৬,৬	১৩
২,২,৯	১৩
২,৩,৬	১১
৩,৩,৪	১০

৩) এখন শেষ কথাটা কি ছিল সেটা আমাদের লাগবে। যা ছিল *সবচেয়ে বড় মেয়েটা.......* কুকুর পছন্দ করে। এই যে 'টা'এর মানে হলো বড় মেয়ে আছে একটা! তাহলে এখন চিন্তা করুন উত্তর কি ১, ৬, ৬ না কি ২, ২, ৯। অবশ্যই উত্তর ২, ২, ৯। কারণ ১টা বড় মেয়ে আছে। এই জন্যই ২, ২, ৯ হচ্ছে উত্তর। সেই বড় মেয়েটা কুকুর, বেড়াল, ভেড়া, ছাগল যা পছন্দ করে করুক। সেটা ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে বড় আছে একটা। এখন আমরা ২য় সমস্যায় চলে যাই। ২য় সমস্যাটা ছিল এরকম যে সুখনগর আর দুঃখনগর এ রকম দুইটা রাস্তা আছে। রাস্তার সামনে দু'জন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজন সবসময়ই সত্যি কথা

বলে আর একজন সবসময়ই মিথ্যা কথা বলে। কে যে সত্যি কথা বলে আর কে যে মিথ্যা কথা বলে এটা কিন্তু আপনি জানেন না। এদের যেকোন একজন কে একটা মাত্র প্রশ্ন করে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে সুখনগরের রাস্তাটা কোন দিকে, যে দিকে আপনি যেতে চান। তো প্রশ্নটা আসলে এরকম, যে কোন একজনকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

আচ্ছা ভাই, আমি যদি অন্য দারোয়ানকে প্রশ্ন করি যে, সুখনগরের রাস্তাটা কোন দিকে তাহলে সে কোন দিকে দেখাবে?

এই প্রশ্নের যে উত্তর আপনি পাবেন, সেই দিকে না গিয়ে উলটো দিকে গেলেই আপনি সুখনগরে পৌঁছে যাবেন। দেখুন আপনি কী করলেন, আপনি একজনকে প্রশ্ন করছেন কিন্তু অন্য দারোয়ানের কথা ঘুরিয়ে আসছেন। এটাই হলো এখানকার আসল বুদ্ধিটা। এখন বোঝার চেষ্টা করি ব্যাপারটা। এদের দু'জনের মধ্যে যেকোন একজন কিন্তু মিথ্যা বলে, এটা আপনি নিশ্চিত। কে যে মিথ্যা বলে সেটা আপনি জানেন না, কিন্তু এতটুকু জানেন যে দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যা বলে। এখন কথাটা যখন আপনার কাছে ঘুরে এসে পৌঁছাবে, এটা যেকোন একজনের কাছে কথাটা কিন্তু মিথ্যা হয়ে যাবে। যদি মিস্টার ক মিথ্যা বলে তাহলে মি. খ সত্যি বলবে। আর যদি মি. ক মিথ্যা বলে তাহলে খ সত্যি বলবে। এদের যেকোন একজন কথাটাকে মিথ্যা বানিয়ে দেবে, আপনার কাছে সবসময় মিথ্যা কথা পৌঁছাবে। এটাকে বলা যায় "প্লাসে মাইনাসে মাইনাস। মাইনাস প্লাসেও মাইনাস।

ধরা যাক ক সত্যবাদী, এবং সুখনগর পশ্চিমে। আপনি ক কে প্রশ্ন করেছেন, 'আচ্ছা আমি যদি খ কে জিজ্ঞেস করি, তাহলে সে রাস্তাটা কোনদিকে দেখাবে'? ক সত্যবাদী মানে কিন্তু খ মিথ্যাবাদী। তাহলে খ আসলে বলত সুখনগর পূর্বদিকে। সত্যবাদী ক আপনাকে দেখাত পূর্বদিকে। এর উল্টোদিকে মানে পশ্চিমে গেলেই আপনি সুখনগরে পৌঁছে যাবেন! যদি ক মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে কী হবে সেটা আপনি ভাবুন। পারবেন, আপনার উপর আমার বিশ্বাস আছে ...

গণিতের এমন সমস্যাগুলোর মাঝে কিছু কিছু সমস্যা আছে যেগুলো মানুষকে বহু বছর ভাবিয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে অসাধারণ সমস্যাটা বলা হয় 'ফার্মার শেষ থিওরেম-কে। 'পিয়েরে দ্যা ফার্মা' একজন অসাধারণ গণিতবিদ ছিলেন। তার খুব প্রিয় একটা বই ছিল আসলে ডায়োফেন্টাসের (Diophantus) লেখা 'Arithmatica'। তো সেই

বইয়ের মার্জিনে মার্জিনে তিনি নিজের আবিষ্কারগুলো লিখে রাখতেন! তো একবার তিনি লিখেছেন–...। আচ্ছা, তার একটু পেছনের কথা বলি। আমরা জানি কোন কোন বর্গসংখ্যা আছে যেগুলোকে দুইটা বর্গের যোগফল হিসাবে লেখা যায়। যেমন ৫^২ কে লেখা যায় ৩^২ + ৪^২ । ১৩^২ কে লেখা যায় ৫^২ + ১২^২ । কিন্তু ফার্মা খেয়াল করলেন যে একটা পূর্ণসংখ্যার বর্গকে যেমন দুইটা পূর্ণসংখ্যার বর্গের যোগফল হিসাবে লেখা যায়, পূর্ণসংখ্যার একটা cube-কে কখনোই ২টা cube-এর যোগফল হিসাবে লেখা যায় না! তিনি এটা খেয়াল করলেন। তিনি আরও দেখলেন শুধু cube-না, এমনকি এর উপরে যত power আছে কোনকিছু to the power 4, to the power 5 এমন যেকোন সংখ্যাকে তাদের ঐ same power এর দুটো সংখ্যার যোগফল হিসাবে লেখা যায় না। অতএব, n যদি একটা পূর্ণসংখ্যা হয়, আর এটার মান 2 এর থেকে বড় হয়, তাহলে a^n – এটা কখনোই $b^n + c^n$ এর সমান হবে না, যদি a, b, c পূর্ণসংখ্যা হয়। এটা কখনোই হতে পারবে না। এটা তিনি লিখলেন এবং তিনি কী করলেন, তিনি তার বইটার মার্জিনে লিখে রাখলেন যে হ্যাঁ, 'আমি এই ব্যাপারে একটা দারুণ প্রমাণ পেয়েছি, কিন্তু সেই প্রমাণটা লেখার মতো যথেষ্ট জায়গা এই মার্জিনে নেই।" এই যে মশকরাটা তিনি করলেন, এই যে তিনি বললেন যে মারজিনে জায়গা নেই– কী যে ভোগান্তিটা মানুষের হলো! এটা তিনি বললেন ১৬৩৭ সালে। তারপরে ৩৫৮ বছর ধরে গণিতবিদরা মনে করলেন যে হ্যাঁ, তিনি যখন বললেন যে প্রমাণটা আমি জানি, তারমানে প্রমাণ নিশ্চয়ই আছে। তারা প্রমাণ বের করার চেষ্টা করলেন ৩৫৮ বছর ধরে। শত শত গণিতবিদ চেষ্টা করে গেলেন কিন্তু কেউই বের করতে পারলেন না। অবশেষে, In the year 1995, andrew Wiles প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তিনি প্রমাণটা করতে পেরেছেন!

এই যে সমস্যাটা– এটা মানুষকে পুরো বন্য বানিয়ে ফেলেছিল। আবার কিছু সমস্যা আছে যে সমস্যাগুলো আসলে নিজেই বন্য সমস্যা নামে পরিচিত। তাদের কে Wild problem বলা হয়। তার মধ্যে একটা আছে, ১৩ কে সমান দুই ভাগ করে ৮ বানাতে হবে। কি! ১৩ কে দুই ভাগে ভাগ করলে আবার ৮ হয় নাকি। হ্যাঁ। এটাকে বানাতেই হবে। যাই হোক এটা পুরোপুরি Mathematical না আসলে। এটাকে আসলে বন্য

সমস্যাই বলা উচিত। সমস্যাটার উত্তর হচ্ছে এরকম যে, ১৩। এটাকে আমরা রোমান সংখ্যায় লেখি এই যে XIII। এখন এটাকে আমরা সমান দুই ভাগে ভাগ করি। এই আড়াআড়ি মাঝখান দিয়ে একটা দাগ টেনে দিয়ে সমান দুই ভাগে ভাগ করলাম।

XIII VIII

এখন তাকিয়ে দেখুন, নিচের টুকু যদি মুছে দেই তাহলে উপরে আছে ৮। ১৩ কে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ৮ বানিয়ে দিলাম। এটাকে পুরোপুরি একটা ভুয়া সমস্যা মনে হচ্ছে তাই না?

এরকম ভুয়া সমস্যা অনেকগুলোই আছে। যেমন, একটা problem আছে যেটা দেখতে ভয়াবহ লাগে। O,T,T,F,F,S,S....? এরপর কত হবে? এটা দেখলে মনে হয় যেন কি না কি সমস্যা। O থেকে T চারটা পরে। T এর পরে F মানে পিছিয়ে গেছে আবার সামনে আগাচ্ছে। আসলে ব্যাপারটা কিছুই না। এগুলো হচ্ছে 1, 2, 3, 4 এর প্রথম অক্ষরগুলো। যেমন O মানে one, T মানে Two, এভাবে যেতে যেতে S মানে Six, S মানে Seven, এর পর হবে E। যার মানে Eight।

এরকম সমস্যা আরো একটা আছে, এটার মতোই কিন্তু সেটার চিন্তাটা আসলে অনেক সুন্দর। যেমন, এখানেও পরের পদটা আপনাকে বের করতে হবে।

১,১১,২১,১২১১,১১১২২১, ?

১ম পদটা মনে করুন ১ এরপর ১১, এরপরে ২১, এর পরে ১২১১, তারপরে ১১১২২১, এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এর পরের পদটা কত হবে। এ সমস্যাটার উত্তর যদি আপনি বের করতে চান, আপনার যে জ্ঞানটা লাগবে, সেটা হচ্ছে ক্লাস ওয়ান এর জ্ঞান। শুধু গুনতে পারতে হবে। বলে রাখি এখানে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ কিছুই নেই। শুধু গুনতে পারতে হয়। দেখেই মনে হচ্ছে হ্যাঁ, কিছু একটা যেন I d e a করা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে ১, আবার ১ এরপর ১ বসে গেছে। তারপর ২ তো, ১ আর ১ যোগ করলে ২। না!! আমি বলে দিয়েছি যোগ করা যাবে না। আচ্ছা, কী হতে পারে? তাহলে ২১ থেকে ১১ বিয়োগ করলাম। না, বিয়োগ করা যাবে না। তাহলে কি আসলে, কি হতে পারে। ২১ আবার ১২১১। এটার মূল উত্তরটা বলে দেই। এটা খুবই সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আসলে– খুবই মজার। এটা যদি আপনি পারতে চান, তাহলে আপনাকে জোরে জোরে পড়তে হবে। পড়তে পারলে এটা পারা যায়। কী রকম?

আমি পড়ি, 'এক'। এরকম পড়লে হবে না। **কতগুলো কী** আছে এটা পড়তে হবে। একটা পদে যা পড়ব সেটা লিখব পরের পদে গিয়ে! মানে কী?

! শুরুতে আছে একটা এক। সেটাই আমি লিখেছি পরের পদে ১টা ১, মানে ১১। ভালো করে দেখুন দ্বিতীয় পদে কী আছে? দুইটা এক, ২টা ১ মানে– ২১। দ্বিতীয় পদে যা পড়লাম, সেটা লিখলাম তৃতীয় পদে– ২১। এইবার– তৃতীয় পদে খেয়াল করুন, এখানে কী আছে? প্রথমে আছে, একটা দুই, তারপর আছে একটা এক। আমি সেটাই লিখেছি পরের পদে– আমি লিখেছি ১টা ২, আর ১টা ১। মানে হচ্ছে ১২১১। ভালো করে দেখুন চতুর্থ পদ– প্রথমে আছে ১টা ১। তারপরে আছে ১টা ২। তারপর আছে ২টা ১। এবং আমি তাই লিখেছি ১১১২২১। সুতরাং এর পরের পদ কী হবে চিন্তা করুন। প্রথমে কতগুলো ১ আছে চিন্তা করুন। এক্সাথে ৩টা ১ আছে। অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে ৩টা ১। মানে ৩১। এরপর কতগুলো ২ আছে? ২টা ২। মানে ২২। এবং শেষে আছে ১টা ১। মানে ১১। তো এই হচ্ছে পরের টার উত্তর ৩১২২১১। এটা খুব সুন্দর তাই না?

এবার আপনাদের কে কিছু নিষ্ঠুর সমস্যার কথা বলি। মনে করুন, আপনার কাছে একটা ছুরি আছে। এই ছুরিটা দিয়ে আপনি কোপ দিবেন। কোথায়? জন্মদিনের কেকে। তো জন্ম দিনের কেকে ৩টা কোপ দিতে হবে। ৩টা কোপ দিয়ে র্সবোচ্চ কতগুলো টুকরো করা যায়। আমি উত্তর বলে দেই। উত্তর হচ্ছে ৮টা টুকরো করা যায়। আপনাদের কে বের করতে হবে কিভাবে ৮টা টুকরা করা যায়। এটা কিন্তু খুব সোজা না। Normally আপনি যদি মাঝ খান দিয়ে কাটেন, মানে ৩টা কোপ দেন তাহলে ৬ টুকরো হবে। কিন্তু আমি বলেছি সর্বোচ্চ ৮টা টুকরা করা যায়। কিভাবে? সেটা আপনাদের কে চিন্তা করতে হবে।

এবার চিন্তা করুন আরো একটা সমস্যা। আপনার কাছে যদি ৩টা ম্যাচের কাঠি থাকে কতগুলো ত্রিভুজ বানানো যাবে? ১টা ত্রিভুজ বানানো যাবে। আসলে একটা সমবাহু ত্রিভুজ বানানো যাবে। সবগুলো বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হলে একে বলে সমবাহু ত্রিভুজ। আপনাকে যদি ৬টা ম্যাচের কাঠি দেওয়া হয় তাহলে সর্বোচ্চ কতগুলো সমবাহু ত্রিভুজ বানানো যাবে। যেগুলোর প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান। এবং ত্রিভুজগুলো সমবাহু ত্রিভুজ হতে হবে। আমি উত্তর বলে দিচ্ছি। উত্তর হচ্ছে ৪টা। কিভাবে হলো, সেটা আপনাদেরকে বের করতে হবে!

গণিতের যে মায়া, গণিতের যে সৌন্দর্য, তার অনেক বড় অংশ হচ্ছে ‘চিন্তা’র মাঝখানে। আপনি যখন খুব সুন্দর করে কিছু একটা চিন্তা করেন, আপনি এটার সমাধানে পৌঁছান কি না পৌঁছান, ঐ চিন্তাটুকুই অনেক বেশি আনন্দের। ঐ চিন্তাটুকুর জন্যই গণিত করা যায়। এবং আমি আরো বিশ্বাস করি, শুনতে অনেকটা রূপকথার মতো লাগতে পারে, কিন্তু আমি সত্যিই বিশ্বাস করি– যখন আমরা কোন একটা ভালো চিন্তা করি, তখন কল্পনার জগতে একটা ফুটফুটে সুন্দর স্বপ্নের শিশু জন্ম নেয়। সে স্বপ্নের শিশুটা হয়তো একদিন বড় হয়ে অনেক বড় একটা অর্জনে পরিণত হবে। ভালো থাকুন, চিন্তা শুভ হোক!

গণিতের রঙ্গে:পর্ব ৭

প্রিয় পাই (π)

=৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২৩৮৪৬২৬৪৩৩৮৩২৭৯৫০২৮৮৪১৯৭১৬৯৩৯৯৩৭৫১০৫৮২০৯৭৪৯৪৪৫৯২৩০৭৮১৬৪০৬২৮৬২০৮৯৯৮৬২৮০৩৪৮২৫৩৪২১১৭০৬৭৯৮২১৪৮০৮৬৫১৩২৮২৩০৬৬৪৭০৯৩৮৪৪৬০৯৫৫০৫৮..... এতক্ষণ হড়হড় করে যেটা বলছিলাম, সেটা হলো π এর মান। একদমে এরচেয়ে আর বেশি বলতে পারি না। যাই হোক, আমি এটা কোনদিনও বলে শেষ করতে পারতাম না। কারণ আজ থেকে বহু বছর আগে, ১৭৬১ সালেই Lambart প্রমাণ করে গেছেন, π হচ্ছে একটা অমূলদ সংখ্যা, যেটা কোন দিনই শেষ হবে না। এবং শেষ হবে না শুধু তাই না, এই যে ১/১১ যেমন .০৯০৯০৯ এমন করে বার বার আসে, এমন করে বারবার কোন কিছু π মধ্যে আসবে না। এবং শুধু তাই না, কোন নির্দিষ্ট pattern ও পাওয়া যাবে না যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এরকম পর পর কিছু আছে, এই ধরনের কোন কিছু কখনোই π এর ভেতর পাওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে একটা অমূলদ সংখ্যা। আমি খুব বেশি আর পারি না। আমি মুখস্ত পারতাম ৩২৮ ঘর পর্যন্ত। আমাদের ১ বছরের জুনিয়র, 'মাহফুজ সিদ্দিকী হিমালয়' ও আসলে ২৩৩৮ ঘর পর্যন্ত জানে। 'মুনিম' বলতে পেরেছিল ১০১০ ঘর পর্যন্ত। ওদের কাছে আমি একেবারেই নস্যি। সারা পৃথিবীর Record-এর কথা যদি চিন্তা করা হয়, ওরা আবার তাদের কাছেও নস্যি। সারা পৃথিবীর Record এখন গিনেস্ বুক অনুসারে 'লু চাও' এর হতে। 'লু চাও' বলতে পেরেছিল ৬৭৮৯০ ঘর পর্যন্ত। এটা বলতে সময় লেগেছিল ২৪ ঘণ্টা ৪ মিনিট। যাইহোক, আরেক জন আছেন জাপানের 'আকিরা হারাগুচি' উনি নাকি ১ লক্ষ ঘর পর্যন্ত বলতে পারতেন। তো গিনেস্ বুক এখনো তাকে যাচাই করতে পারে নাই। তো যাইহোক, এই যে π। এই π জিনিসটা কী? সেটা আগে বলি। তারপর π

এর বিভিন্ন কথা আমি বলতে চাই। কেন π নিয়ে এতো মাতামাতি, কেন π এতো সুন্দর, সে ব্যাপারটা আমি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। π কী, এটা বলতে গেলে আসলে একটা বৃত্তকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। বৃত্তের পরিধিকে যদি ব্যাস দিয়ে ভাগ করা হয়, সেটা হচ্ছে π । আমরা জানি, একট বৃত্তের একটা বিন্দু থেকে যদি আমরা যাত্রা শুরু করি, পুরো বৃত্তটা ঘুরে যদি আবার ঐ বিন্দুতে ফিরে আসি, যতটুক দূরত্ব আমরা অতিক্রম করব, এটা হচ্ছে বৃত্তের পরিধি। আর যদি এই বিন্দু থেকে সোজা কেন্দ্র বরাবর রওনা দিয়ে বৃত্তের অন্য পাশের বিন্দুটাতে আমি পৌঁছাই, তাহলে যেই সরলরেখাটা পাওয়া যাবে, এই রেখাংশটুকুর দৈর্ঘ্যই হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস। আগেকার মানুষ [প্রাচীনযুগের মানুষ] খেয়াল করেছিল যে, বৃত্ত যেই সাইজেরই হোক না কেন, যত বড় আকারের বা যত ছোট আকারেরই বৃত্ত হোক না কেন, এই পরিধিকে যদি ব্যাস দিয়ে ভাগ করা যায়, সেটার মান সবসময় একই রকম হয়। ব্যাসের তুলনায় পরিধি সবসময় ৩ গুণের একটু বেশি হয়। সবসময় যে কোন বৃত্তের জন্য এটা সত্যি। আমি বলেছি ৩ গুণের একটু বেশি, সেটা কতটুকু বেশি, এটা নিয়ে প্রাচীন মানুষ সবসময়ই ভেবেছে। তো প্রথম যে নিদর্শনটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে, মিশরের 'রাইন্ট প্যাপিরাসে' আছে। আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগের কথা। ওরা বলেছিল এটার মান হয় মোটামুটি ৩.১২৫। সেই মানটা আসলে পুরোপুরি ঠিক না। আমরা জানি এটার মান হচ্ছে এখন ৩.১৪ এর একটু বেশি। এই সুযোগে বলে রাখি ৩.১৪– যদি আমেরিকান সিস্টেমে তারিখ গণনা করা যায়, সেটা হয় মার্চের ১৪ তারিখ। মানে ১৪ই মার্চ। সেই অনুসারে ১৪ই মার্চ হচ্ছে বিশ্ব পাই দিবস। পাই দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে [লেখকের কথা: ভিডিওটি পাই দিবসে করা হয়েছিল, ভিডিওর দর্শকদেরকে তাই শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম। এই বইয়ের পাঠক যখন পড়ছেন, তার আশেপাশে পাই দিবস থাকলে, তিনিও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন! না থাকলেও অগ্রিম শুভেচ্ছা!]।

তো প্রাচীন মানুষ π নিয়ে চিন্তা করতে থাকলো। π নিয়ে যখন মিশরের মানুষজন ভেবেছিল, সেই সময়ের কথা বলা যাক। সেই খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সালের কথা। সেই সময় তারা কিন্তু Mathematically এটাকে derive করতে পারেনি। তারা সম্ভবত এটাকে গুনে গুনে বের করার চেষ্টা করেছিল। প্রথম গণিতিকভাবে যিনি বিশ্লেষণ করে বের করার চেষ্টা করেছিলেন,তিনি হচ্ছেন মহান 'আর্কিমিডিস'। সেই 'আর্কিমিডিস', যিনি

ইউরেকা বলে দৌড় দিয়েছিলেন। যাহোক, আর্কিমিডিস যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন সেটা একটা অসাধারণ পদ্ধতি ছিল। আমি নিশ্চয়ই কোন একটা পর্বে ঐ ব্যাপারটা দেখাবো। এই পর্বে না। তো আর্কিমিডিস বের করতে পেরেছিলেন যে এই π, π জিনিসটার মান হবে ২২৩/৭১ থেকে ২২/৭, এই দুটো সংখ্যার মাঝামাঝি। তিনি এটা বের করেছিলেন আসলে একটা সম-ছিয়ানব্বইভুজ নিয়ে। আমরা ত্রিভুজ জানি, চর্তুভুজ জানি, এমন করে সম-৯৬ভুজ, যেখানে ৯৬টা সমান সমান বাহু ও সমান সমান কোণ আছে, এটা নিয়ে তিনি গবেষণা করে পাই এর মান বের করেছিলেন। এবং আর্কিমিডিসের এই কাজটা খুবই দারুণ একটা কাজ ছিল। [খ্রিষ্টপূর্ব ২৩০ এর দিকের ঘটনা]

আর্কিমিডিসের পরে মানুষ যখন π এর মান বের করার চিন্তা করল, তারা এটার মান বের করার চেষ্টা করেছে ধারার সাহায্যে। ধারা নিয়ে বলতে গেলে প্রথমে যার কথা বলা উচিত তিনি হচ্ছেন আমাদের এই উপমহাদেশের 'মাধব' (১৩৪০-১৪২৫)। মাধব একটা ধারা তৈরি করলেন। তিনি দেখালেন পাই এর মানটা হচ্ছে এরকম

$$\pi = 4\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots \infty\right)$$

এভাবে একবার প্লাস, একবার মাইনাস এবং নিচে এভাবে বিজোড় সংখ্যাগুলো আসতে থাকবে। এই সিরিজ বা ধারাটা আবার পরবর্তীতে আবিষ্কার করেন 'গ্রেগরি এবং লিবনিজ'। এবং তাদের নাম অনুসারে এই সিরিজটাকে সারা বিশ্বে মানুষ গ্রেগরি ও লিবনিজ সিরিজ-ই বলে, যদিও তাদের আবিষ্কারের প্রায় ৩০০ বছর আগেই মাধব এটা আবিষ্কার করেছিলেন। যাহোক, মাধব তার ধারা ব্যবহার করে প্রায় ১১ ঘর পর্যন্ত π এর মান নিখুঁতভাবে বের করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে, মাধব যে সিরিজটা দিয়েছিলেন এটা খুব একটা কাজের সিরিজ না। এই সিরিজটা খুব আস্তে আস্তে মান দেয়। ২০০ বা ৩০০ ঘর যদি আমি এই ঘরে নেই, মানে একবার ৩, একবার ৫, একবার ৭ এমন করতে করতে ৩০০ ঘর পর্যন্ত যদি আমি যাই। তখন ৩.১৪, এই জিনিসটা মোটামুটি ঠিক মতো পাওয়া যায়। আরো যদি অনেক নেওয়া যায় তাহলে ৩.১৪১, এরকম একটা জিনিস আসতে পারে। এটা দিয়ে আসলে খুব বেশি একটা কাজ হয় না। পরবর্তীতে 'শার্প ও মেশিন' এরকম গণিতবিদেরা এ

ধারাটাকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করেন। এবং তারা আরো দারুণ কিছু সিরিজ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সবচেয়ে দারুণ সিরিজ যারা দিয়েছিলেন, তাদের মাঝখানে রয়েছে আমাদের উপমহাদেশের গণিতবিদ 'শ্রীনিবাস রামানুজন'। রামানুজন বেশ কয়েকটা ধারা দেন, যেগুলো দিয়ে খুব দ্রুত পাইয়ের অনেকগুলো মান বের করা গিয়েছিল। তার একটা বিখ্যাত ধারা ছিল এমন:

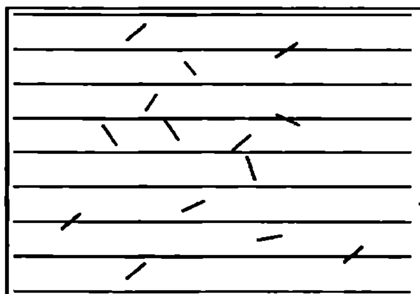
$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k)!\,(1103 + 26390k)}{(k!)^4 396^{4k}}$$

এবং আরো একটা ধারা দিয়েছিলেন আমেরিকার দুই ভাই। 'চাদনোভস্কি ব্রাদারস্' বলে ওদেরকে। তো তারা যে ধারাটা দিয়েছিলেন সেটা দিয়ে ও অনেক বেশি মান বের করা যায়। এ যে ধারা দিয়ে মান বের করা যায় কিন্তু, চিন্তা করুন ক্যালকুলেটরের তো আবিষ্কার হয়নি তখনও। ক্যালকুলেটর যদি আবিস্কৃত না হয়, তাহলে তো কম্পিউটারের প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে ঐ ধারাগুলো, ঐ কঠিন কঠিন যোগগুলো মানুষ কি ভাবে করবে। দিনের পর দিন এভাবে বসে বসে যোগ করবে। এটা খুবই! খুবই একটা কষ্টকর ব্যাপার ছিল। তার পরও মানুষ কিন্তু বের করার চেষ্টা করেছে। এবং খুবই দারুণ ভাবে বের করার চেষ্টা করেছে। কার্ল ফ্রেডরিখ গাউসের কথা আমি আগে বলেছি। তিনি অসাধারণ একজন গণিতবিদ। তিনি যেটা করলেন। তিনি একটা জীবন্ত কম্পিউটার ব্যবহার করলেন। সেই সময় একজন মানুষ ছিল 'জাকারিয়া ডেইস'নামে। ডেইসের তেমন কোন গাণিতিক প্রতিভা ছিল না। কিন্তু তিনি যেটা করতে পারতেন– মনে মনে অনেক বড়ো বড় সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সবকিছু এমনিএমনিই করে ফেলতে পারতেন! তাকে ব্যবহার করে গাউস, pi এর মান প্রায় ২০০ ঘর পর্যন্ত বের করে ফেলেছেন। আসলে ডেইস মনে মনে এটা হিসাব করেছিলেন। চিন্তা করুন, তাকে আসলে একটা কম্পিউটারের মধ্যে করেই চিন্তা করা যায়। তাকে Programme করে দেওয়া হয়েছে, গাউস ওকে বলে দিয়েছে– নাও বাবা, তোমাকে ফরমুলা দিয়ে দিলাম, তুমি এখন মনে মনে ক্যালকুলেশন কর। সে হিসাব করে বলে দিল। পাইয়ের কথা বলতে গেলে আরো একজনের নাম এসেই যাবে। তিনি হলেন 'উইলিয়াম শ্যাঙ্কস'। [কম্পিউটার ছাড়া হাতেকলমে পাইয়ের মান সবচেয়ে বেশি বের করার রেকর্ডটা তার।] তার জীবনের ১৫টা বছর পাই

এর মান বের করার পেছনেই ব্যয় করে ফেলেছেন। [প্রতিদিন সকালে পাইয়ের মান হিসাব করতেন, সারা দুপুর সেগুলো যাচাই করে দেখতেন ঠিক আছে নাকি!] ১৫ বছর ধরে তিনি পাই এর মান বের করলেন ৭০৭ ঘর। পরবর্তীতে দেখা গেল ৫২৭ এর পর বাকি ঘরগুলো ভুল ছিল। তো এই ভুলটা ধরা পড়ার ইতিহাস টাও খুব মজার। আমরা অনেকেই বোধহয় 'ডি মরগ্যান'স্ ল' এটার নাম শুনেছি সেট থিওরিতে। এই ডি মরগ্যান সাহেব, ঐ সময়ের মানুষ। ডি মরগ্যান দেখলেন যে ৫০০ ঘরের পর থেকে ঐ পাই এর মানের ভেতরে ৭ একটু বেশি বেশি আছে। এটা সন্দেহজনক। কারণ হচ্ছে পাই হচ্ছে random number। π এ দশমিকের পর যে অঙ্কগুলো আসে 1415926... এগুলো কোনটার পর কোনটা আসবে এটা কোনভাবেই বোঝার কথা না। কোনদিনও কোন অংক অন্যদের থেকে অনেক বেশি বার আসবে না। কী রকম? ধরা যাক, আমি যদি ১০ কোটি ঘর নিয়ে চিন্তা করি, তার মধ্যে কখনোই আমি দেখব না যে ৭ এসেছে ৫ কোটি বার। এ রকম কখনো দেখবো না। প্রতিটি অঙ্ক– ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এমন প্রত্যেকটা ডিজিটই মোটামুটি ১ কোটি বার করে করে আসবে। ১০ কোটি বার নিলে, এই ১০টা জিনিস ১ কোটি বার করে আসবে। আমি বলছি না যে exactly ১ কোটি সে রকম না। তো এক কোটির কাছাকাছি হবে। কোণ অঙ্ক যদি দেখা যায় মাত্র ২ লক্ষ বার এসেছে, তখন বুঝতে হবে যে এটা আসলে random না। random হলে এ শর্ত টা তাকে মেনে চলতে হবে যে সবগুলোই মোটামুটি সমান ভাবে প্রায় আসবে। এটা নিয়েই সন্দেহ ছিল ডি মরগ্যানের। তিনি দেখলেন ৭ এর সংখ্যাটা কেমন বেশি বেশি লাগছে। কিন্তু তারপরও তিনি শুধু সন্দেহই পোষণ করেছিলেন। তিনি তখন প্রমাণ করতে পারেননি। তো তারপর প্রায় ৭১ বছর পরে, ঐ যে শ্যাঙ্কস্ বের করেছিলেন ১৮৭৩ সালে, তার প্রায় ৭১ বছর পরে ১৯৪৪ সালে। তখন গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল হ্যাঁ, আসলেই ৫২৭ ঘরের পর থেকে বাকি ডিজিটগুলো ভুল ছিল। হায় রে! বেচারার জীবনের এতগুলো বছর!

π এর মান বের করার সবচেয়ে অদ্ভুত যে পদ্ধতিটা সেটা বলা যায়, Buffon's needle বা বুফনের সুঁই। এটা তৈরি করেছিলেন একজন ফ্রেঞ্চ গণিতবিদ যার নাম ছিল "কোঁট-দ্য-ব্যফোঁ (Comte De Buffon)" [আমরা ইতালীয় কায়দায় বুফন বলব]। এই যে বুফন, ওনার আইডিয়া টা ছিল এরকম– একটা রুল টানা খাতা নিতে হবে। সেই খাতার

মধ্যে ছোট ছোট কাঠির টুকরা ছিটিতে দিতে হবে। এই যে অনেকগুলো রুলটানা আছে, তার দুইটা দাগের মাঝখানে যে দূরত্বটুকু, তার থেকে একটু ছোট আকারের কিছু কাঠি তিনি এই কাগজের উপরে ছেড়ে দিলেন। সেই কাঠিগুলোর মধ্যে সবগুলোই যে দাগ ছুঁবে তাতো না। কিছু কিছু হয়তো এই দাগগুলো স্পর্শ করবে। আবার কিছু কিছু কাঠি হয়তো মাঝখানে পড়বে। কতগুলো কাঠি দাগকে স্পর্শ করেছে আর কতগুলো দাগকে করেনি, এটা দেখে π এর মান Idea করে ফেলা যায়! ফরমুলাটা হচ্ছে এরকম যে $\pi \sim 2ln/th$, যেখানে l হচ্ছে কাঠির দৈর্ঘ্য, t হচ্ছে দুটো দাগের মধ্যবর্তী দূরত্ব, n হচ্ছে মোট কাঠির সংখ্যা, এবং h হচ্ছে যতগুলো কাঠি দাগ স্পর্শ করছে তাদের সংখ্যা। এটা দিয়ে π এর মান মোটামুটি ভালো ভাবেই বের করা যায়। এবং সমস্যা হচ্ছে যে, এ পদ্ধতিটা আসলে সমস্যা ভিত্তিক পদ্ধতি। যত বেশি sample নেওয়া যাবে, এই পদ্ধতিগুলো তত ভালো কাজ করবে, তত বেশি নিখুঁত ভাবে এর মান বের করা যাবে। যত বেশি কাঠি আপনি নেবেন, যত বেশি বার নিক্ষেপ করে গড় করবেন, তত বেশি নিখুঁতভাবে π এর মানটা পাওয়া যাবে। খুবই অদ্ভুত একটা পদ্ধতি, তাই না?

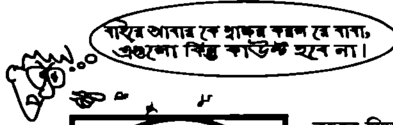


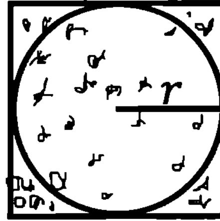
$$\pi \simeq \frac{2ln}{th}$$

যেখানে, $l =$ কাঠির দৈর্ঘ্য
$t =$ দুইটা কাঠির মধ্যবর্তী দূরত্ব
$n =$ মোট কাঠির সংখ্যা
$h =$ যতগুলো কাঠি দাগ স্পর্শ করেছে তাদের সংখ্যা

এরকম একটা পদ্ধতি আমাদের দেশেও, আমার খুব কাছের একজন বন্ধু 'ডা: সৌমিত্র চক্রবর্তী' বের করেছেন। তো ওর নাম অনুসারে আমরা এটাকে সৌমিত্রের স্বাক্ষর বলি। আমরা অনেক জায়গায় গিয়ে গিয়ে এটার পরীক্ষাটা করেছি। [এটা মন্টে কার্লো মেথড এর একটা ভার্সন]।পরীক্ষাটা মজার। Idea টা বলি। বর্গক্ষেত্র আকারের একটা বড় কাগজ নিয়ে আমরা স্কুলে স্কুলে যেতাম। গিয়ে স্টুডেন্টদের বলা হতো তোমরা এটার মধ্যে স্বাক্ষর কর। যেখানে খুশি সেখানে স্বাক্ষর কর। তো এরা ইচ্ছা মতো পুরো বর্গক্ষেত্রটার ভেতরে নিজেদের নাম স্বাক্ষর করতো।

তার পরে যেটা করতাম, ঐ বর্গক্ষেত্রটার ভেতরে সমান করে এটেঁ যায় এমন একটা বৃত্ত আমরা আকঁতাম [বৃত্তটা অন্য আরেকটা কাগজে কেটেও আনা হত অনেক সময়]। বৃত্তটা আঁকার পর এর ভেতরে কতগুলো স্বাক্ষর পড়েছে আর পুরো বর্গক্ষেত্রটার ভেতরে কতগুলো স্বাক্ষর আছে , তাঁর অনুপাত থেকে π এর মান বের করে ফেলা যায়। আইডিয়া তেমন খুব বেশি কিছু না। Idea টা এ রকম যে বৃত্তের ভেতরে স্বাক্ষরের সংখ্যা / বর্গের ভেতর স্বাক্ষরের সংখ্যা হবে বৃত্তের ক্ষেত্রফল / বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান। এখন আমরা যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধকে r ধরি, তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে πr^2। এবং সে ক্ষেত্রে পুরো বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 2r, ফলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে $4r^2$। তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল / বর্গের ক্ষেত্রফল = $\pi r^2 / 4r^2$। মানে $\pi/4$, তাহলে, বৃত্তের ভেতর ক্ষেত্রফল/ বর্গের ভেতর ক্ষেত্রফল এটার মান পাইয়ের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ। চার দিয়ে গুণ দিলেই পাই পাওয়া যাবে! তাহলে এখান থেকে একটা Idea করে ফেলা যায় যে π এর মান কত হতে পারে।





$$\frac{\text{বৃত্তের ভিতর স্বাক্ষর}}{\text{বর্গের ভিতর স্বাক্ষর}} \approx \frac{\text{বৃত্তের ক্ষেত্রফল}}{\text{বর্গের ক্ষেত্রফল}} \approx \frac{\pi r^2}{(2r)^2} \approx \frac{\pi}{4}$$

π নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি π নিয়ে সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল সেটা ছিল আমেরিকার 'ইন্ডিয়ানা রাজ্যে'। সেখানে একবার কি করা হলো বলি। আসলে এটাই স্বাভাবিক, রাজনীতিবিদরাই এসব উদ্ভট ঘটনা ঘটাতে পারেন, গণিতের মধ্যে এরকম উদ্ভট জিনিস নিয়ে আসতে পারেন। সেখানে যেটা ঘটলো সেটা বলি, সেখানে একটা বিল তোলা হলো, তখনকার ইন্ডিয়ানা General assembly তে, যে এখন থেকে π এর মান হবে ৩.২। কী ভয়াবহ কথা চিন্তা করুন। 'এখন থেকে π এর মান হবে ৩.২, শুধু তাই না। ঠিক আছে, এই যে ৩.২ এটা শুধু আমাদের মধ্যে যারা আছে, মানে ইন্দিয়ানা রাজ্যের যতগুলো স্কুল আছে তারা কোন টাকা ছাড়াই ৩.২ ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু পৃথিবীতে অন্য যে কোন

জায়গায় যখন ৩.২ ব্যবহার করা হবে π এর মান, তখন আমাদেরকে কিছু Royalty দিতে হবে, কারণ আমরা এটা এখানে শুরু করেছি'। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা রক্ষা পেয়ে যায়। কারণ সেখানে একজন গণিতবিদ ছিলেন, যিনি এটার প্রতিবাদ করেন। এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবটা পাশ হয়নি। প্রস্তাবটা পাশ হলে ইতিহাসে একটা ন্যাক্কারজনক অধ্যায় হতো।

যাহোক, π এই ব্যাপারটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালোবাসার। আমার নিজের জীবনের অনেক সুখ-দুঃখ এই π এর সাথে জড়িয়ে আছে। তাই π এর জন্য বলব– π, তুমি আমার সাথে অনেক বেশি আকারে মিশে আছ। কিন্তু কতোটুকু মিশে আছে সেটা আমি বলে বোঝাতে পারব না। অনেক বেশি ভালোবাসি তোমাকে।

π দিবসে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ৮

অসীম ও কুমড়া

বুয়েটের হলে একবার আমরা সব বন্ধুরা মিলে গল্প করছি। গল্প করতে করতে এক পর্যায়ে এক বন্ধু বলল যে, 'দোস্ত আমিতো আমাদের ব্যাচের ঐ মেয়েটাকে দু'চোখে দেখতে পারি না'। আমি বললাম 'কেন, ওতো মানুষ হিসেবে খুবই ভাল'। 'না দোস্ত, আমি ওকে দু'চোখে দেখতে পারি না'। আমি বললাম 'কেন?', ও বলল 'না দোস্ত, ও আমার দুই চোখে আটে না!' বুঝতেই পারছেন। তো আমি আজকে যে জিনিসটা নিয়ে বলব, সেটা আসলে এরকমই একটা জিনিস যে, যেটা আমাদের দুচোখ কেন অজস্র চোখ মিলেও চোখে আটবে না। কখনোই আমাদের চেনা সীমানার মধ্যে তাকে ধরা যাবে না, সংখ্যার সীমার মধ্যে তাকে আটকানো যাবেই না। সে হচ্ছে মহান 'অসীম'। অসীম একটা অনেক বড় ব্যাপার। অসীম, এটা অনেক বড় কিছু একটা। কেন আমি কিছু একটা বলছি বার বার। কারণ প্রথমেই যেটা জানার দরকার, কারণ 'অসীম'কোন সংখ্যা নয়। এটা একটা ধারণা! আমি আবারো বলতে চাই, 'অসীম'কোন সংখ্যা নয়। পৃথিবীতে যত সংখ্যা আছে তাদেরকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্য পাওয়া যায়। কিন্তু অসীমকে যদি শূন্য দিয়ে গুণ করা যায় তখন কী হয়? তখন কী হয় এটা আমরা আসলে ঠিক মতো জানি না। তখন যে কোন কিছুই আসলে হতে পারে। এটাকে বলে 'অনির্ণেয় আকৃতি'। শূন্য গুণ অসীম এটা অনির্ণেয় আকার। $0\times\infty$ এটা আসলেই অনির্ণেয় আকার। আমি যেমন আমার তৃতীয় পর্বে বলেছিলাম যে, শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে একটা অনির্ণেয় আকৃতি আসে। 0 কে 0 দিয়ে ভাগ করা আর 0 কে অসীম দিয়ে গুণ করা এরা কাছাকাছি। দুজনেই আসলে অনির্ণেয় আকৃতি দেয়। এটার মান যে কোন কিছুই আসলে হতে পারে। *অসীম* যদিও কোন সংখ্যা না কিন্তু extended real number system এ অসীমের অস্তিত্ব আছে।

সেখানে আমাদের যে বাস্তব সংখ্যা জগত তার সাথে *ধনাত্মক অসীম* এবং *ঋনাত্মক অসীম* এদের দুজনকেও এক সঙ্গে চিন্তা করা হয়। তো সেই extended real number system এ অসীমকে অনেকটা সংখ্যার কাছাকাছি চিন্তা করা হয় এবং সেখানে সংখ্যার কিছু বৈশিষ্ট্য অসীমকে দেওয়া হয়েছে। যেরকম অসীমের সাথে 1 যোগ করলে কি হবে এবং 2 যোগ করলে কি হবে ও অসীম থেকে 2 বিয়োগ করলে কি হবে। সেই ব্যাপারগুলো ওখানে কিছুটা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তো এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে চলুন আটলান্টিক মহাসাগরের পাড় থেকে একটু ঘুরে আসা যাক। চিন্তা করুন যে, আমি যদি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে এক গ্লাস পানি তুলে নেই তাহলে আটলান্টিক মহাসাগরের পানির কী হবে? আসলে কিছুই হবে না, তাই না? ∞-1=∞। অসীম থেকে যদি 1 বাদ দেওয়া যায় তাহলে অসীমই থাকে। ঠিক একই ভাবে আমি যদি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে দুই গ্লাস পানি তুলে নেই তাহলেও আটলান্টিক মহাসাগরের পানির কিছুই হবে না। অসীম থেকে যদি ২ বাদ দেওয়া যায় তাহলে অসীমই থাকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যদি ∞ থেকে ∞ বিয়োগ করা যায় তখন কী হবে। ধরা যাক, বিশাল বড় আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আমি একটা সমুদ্র বাদ দিয়ে দিলাম। মহাসাগর থেকে যদি সাগর বাদ দেওয়া যায় তাহলে কি হবে। দুটাতেইতো অ-নে-ক পরিমাণে পানি আছে। অনেক থেকে অনেক বাদ দিলে কি হয় সেটা আসলে আমরা জানি না। অসীম থেকে অসীম বাদ দিলে যে কোন কিছু হতে পারে। যেমন এটাকে অনুভবে প্রমাণ করা যায়। ∞-1 এটা অসীমের সমান। ∞-2 এটাও অসীমের সমান। এখন আল যাবর থেকে আমরা পাই, যদি ∞-1=∞ হয়,তাহলে ∞-∞=1। আবার ∞-2=∞। তাহলে ∞-∞=2 হবে। ঠিক একই ভাবে ∞-∞=3,4,5,6 যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ ∞ থেকে ∞ বাদ দিলে কী হয় এটা আমরা আসলে জানি না। এবং এটা আরেকটা অনির্ণেয় আকৃতি (Indeterminate form)। তো অসীম কে নিয়ে বহু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ভেবেছে। তো তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো যার কথা পাওয়া যায়, তিনি হচ্ছেন *জেনো* (Xeno)। জেনোর কিছু paradox আছে। সেই paradox-গুলোর মধ্য থেকে আমি ২টা paradox-কে নিজের মতো করে একটু একসাথে মিলিয়ে বলি। একটাকে বলে একিলিস আর কচ্ছপের প্যারাডক্স, আরেকটা হলো

ডাইকোটমি (dichotomy) প্যারাডক্স। একিলিস ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন বিখ্যাত বীর [আগ্রহীরা হলিউডের 'ট্রয়' মুভিটা দেখতে পারেন, একিলিস সম্বন্ধে অনেক আজেবাজে তথ্য জানতে পারবেন! আর ভালো কিছু জানতে চাইলে হোমারের লেখা ইলিয়ড পড়তে পারেন]। তো সেই একিলিস একদিন নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা কচ্ছপের সাথে তার দেখা। কচ্ছপ তাকে ডাক দিল,

–আরে একিলিস ভাই, কেমন আছ?

একিলিস বলল, হ্যাঁ, ভাল আছি, তুমি কেমন আছ?

–হ্যাঁ, ভাল।' কচ্ছপ বলল, তুমি তো অনেক বড় বীর, তোমার সাথে আমার দৌড় প্রতিযোগিতা করার খুব শখ।

একিলিস শুনে তো খুবই অবাক। মনে মনে ভাবেন –তুই কচ্ছপ, তুই করবি আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা! তো তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার যখন এতোই শখ তাহলে চলো দৌড় প্রতিযোগিতা করি'। তো কচ্ছপ তখন বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দুর্বল, তুমিতো জানোই। তাহলে এক কাজ করি, আমি আধা মাইল আগের থেকেই দৌড় শুরু করি। মানে তোমার আধা মাইল সামনে থাকব'।

এ আর এমন কী! –একিলিস ভাবেন। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই। তুমি আধা মাইল সামনে থাক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি শেষ পর্যন্ত তোমাকে হারিয়ে দিতে পারব। তখন কচ্ছপটা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এক কাজ করি, মনে কর তুমি যেই গতিতে দৌড়াবে, আমি তার থেকে অর্ধেক গতিতে দৌড়াব...'

–'না...... আসলে আমি আরো অনেক বেশি গতিতে দৌড়াতে পারি। আচ্ছা, তুমি যেহেতু বলছো, ঠিক আছে যাও! কচ্ছপ, তুমি যেই গতিতে দৌড়াবে আমি তার থেকে দ্বিগুণ গতিতে দৌড়াবো'।

কচ্ছপ এখন খুব খুশি। তো এবার দৌড় প্রতিযোগিতা যখন শুরু হতে যাবে, হঠাৎ করে কচ্ছপ পিছনে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা একিলিস ভাই, আমি যদি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারি যে, তুমি কোনদিন জিততে পারবে না, তাহলে তুমি কি হার মেনে নিবে?' একিলিস বলল, 'হ্যাঁ, তুমি যদি প্রমাণই করতে পারো, তাহলে শুধু শুধু প্রতিযোগিতা কেন করব, এমনি যুদ্ধ করে গায়ে ব্যথা! বলো তাহলে–'

এইবার কচ্ছপ বলল, 'দেখ একিলিস, তুমি তো আমার দ্বিগুণ গতিতে দৌড়াবে, তাই না? আমরা তো এভাবেই ঠিক করে নিয়েছি?'

–'হ্যাঁ'।
–'আমরা তো একসাথেই দৌড় শুরু করব, তাই না?'
–'হ্যাঁ'।
–'তুমি চিন্তা কর, দৌড়াতে দৌড়াতে তুমি যখন আমার এখানে এসে পৌঁছাবে, মানে তুমি যখন দৌড়াতে দৌড়াতে এই আধা মাইল সামনে এসে পৌঁছাবে, আমি কি আমার আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব? থাকব না। আমি তখন 1/4 দূরত্বে চলে যাব, তাই না? যেহেতু আমি অর্ধেক দৌড়াই। তুমি আধা মাইল আসলে আমি যাব 1/4 মাইল।
–'হ্যাঁ, ঠিক আছে'।
–'এইবার তুমি যখন আমাকে ধরতে আরো 1/4 মাইল যাবে, আমি কি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকব? আমি নিশ্চয়ই আরেকটু এগিয়ে যাব। আমি তখন 1/8 মাইল পরিমাণে এগিয়ে যাব'।
–'হ্যাঁ'।
–'তারপর তুমি যখন আমাকে ধরতে আরো 1/8 মাইল দূরত্বে আসবে, আমি কি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকব? তখন আমি তো আরেকটু এগিয়ে যাব। 1/16 মাইল পরিমাণ। তারপর তুমি যখন আমাকে এই 1/16 পরিমাণে ধরতে আসবে, তখন আমি কি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকব? আমি তো একটু এগিয়ে যাবে। 1/32 পরিমাণে। তারপর তুমি যখন 1/32 করে আমাকে ধরতে আসবে, আমি কি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকব? তার মানে হচ্ছে, তুমি কখনোই আমাকে আসলে ছুঁতে পারবে না। কখনোই তুমি আমাকে ধরতে পারবে না বুঝতে পেরেছো।
একিলিস ভাবলো তাইতো, আমি ওকে ধরতে যেখানেই যাব, কচ্ছপ তার থেকে সামান্য হলেও এগিয়ে থাকবে! সে হার মেনে নিল।

এখন আপনি চিন্তা করুন তো, আসলেই কি একিলিসের হেরে যাওয়ার কথা? কেউ যদি সামনে থাকে, আর আমি যদি ওর পেছনে দ্বিগুণ গতিতে দৌড়াই তাহলে আমি কি ওকে ধরতে পারব না? আমার মনে হচ্ছে পারব। তাহলে এ ব্যাপারটাকে কি ভাবে চিন্তা করা যায়। এই ব্যাপারটাকে যদি চিন্তা করতে হয় তাহলে , এভাবে ভাবি যে, একিলিস কত দূরে গিয়ে তাকে ধরতে পারবে? প্রথমে তাকে যেতে হবে 1/4, এরপর1/4 এভাবে করে $\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+...+\infty\right)$ অর্থাৎ অসীম পর্যন্ত। তার মানে আমরা যদি এই পদগুলো অসীম পর্যন্ত যোগ করতে পারতাম এবং যোগ

করে যদি কোন নির্দিষ্ট মান পাওয়া যেত তাহলে বলা যেত যে, সে কত দূরে গিয়ে ঐ কচ্ছপটাকে ধরতে পারবে। কিন্তু এটা কি আসলেই পাওয়া সম্ভব? উত্তর হচ্ছে : হ্যাঁ। এটা আসলেই পাওয়া সম্ভব। কিভাবে পাওয়া যায়, সেটা খুব সহজেই এভাবে চিন্তা করা যায়। ধরা যাক এটার মান হচ্ছে x।

$$x=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+...+\infty \text{ ---------- } (১)$$

$$\text{তাহলে, } 2x=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\infty \text{ ------ } \quad (২)$$

সবাইকে 2 দিয়ে গুণ করা হয়েছে। এখন যদি আমরা নিচের লাইন (২ নং সমীকরণ) থেকে উপরের লাইনটা (১ নং সমীকরণ) বাদ দিয়ে দেই, অর্থাৎ তাহলে কী হবে?

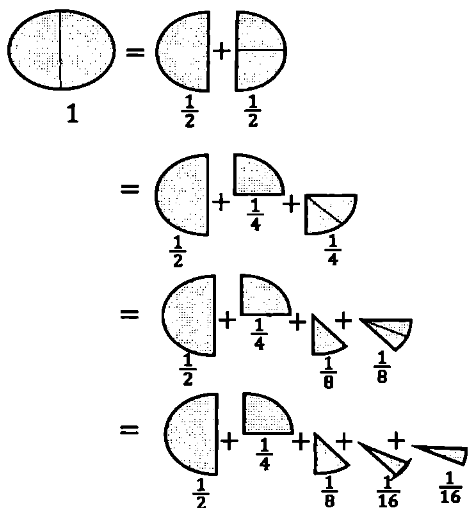
$$2x-x=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\infty\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+...+\infty\right)$$

ডানপক্ষে $\frac{1}{2},\frac{1}{4}$ এমন করে পরের পদগুলো সবই কাটা যাবে, থাকবে শুধু 1 বা, $x=1$ । ১ নং সমীকরণ থেকে আমরা পাব, $1=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+...+\infty$ । এর মানে হলো, $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8}$ এই সবগুলো অসীমপর্যন্ত যোগ করলেও শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে মাত্র 1। তাহলে বুঝা গেল সে 1 মাইল দূরে গিয়েই আসলে ধরে ফেলতে পারবে।

এখন কথাটা হচ্ছে এই ব্যাপারটাকে আমরা feel করব কিভাবে? আমার কাছে এই ব্যাপারটা সনবসময়ই অবাক লাগত। ক্লাস নাইন-টেনে যখন অসীম গুণোত্তর ধারার সমষ্টির ফরমুলা শিখেছিলাম, তখন দেখেছিলাম ওখানে লেখা ছিল যে, গুণোত্তর ধারার সমষ্টি হচ্ছে $\frac{a}{1-r}$ । সেটা দিয়েও এটা বের করা যায়। এখানে a হচ্ছে প্রথম পদ, যার মান এখানে 1/2 খেয়াল করলে দেখা যাবে , প্রতিটা পদ আগের পদের সাথে 1/2 করে করে গুণ হয়ে তৈরি হচ্ছে। যেমন প্রথম পদ1/2 এর সাথে1/2 গুণ হয়ে তৈরি হয়েছে দ্বিতীয় পদ 1/4 । দ্বিতীয় পদ 1/4 এর সাথে 1/4 গুণ হয়ে

তৈরি হয়েছে তৃতীয় পদ $\frac{1}{8}$। $\frac{a}{1-r}$ এই সূত্রে r হচ্ছে সাধারণ গুণিতক, যেটা প্রতিবার গুণ হচ্ছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে r এর মান হচ্ছে $\frac{1}{2}$। তাহলে সূত্র থেকে পাব, সমষ্টি হচ্ছে $\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}=1$। তার মানে সূত্র থেকেও পাওয়া যাচ্ছে এই অসীম গুণোত্তর ধারার যোগফল হচ্ছে 1

কিন্তু এরপরও আসলে মন মানতে চায় না। আমি তো কম যোগ করছি না, অসীম পর্যন্ত যোগ করছি, তারপরেও কেন মান হবে শুধুমাত্র ১? এটাকে আমি সুন্দর করে feel করতে পেরেছিলাম *কুমড়া থিওরি* থেকে! *কুমড়া থিওরিটা* এখন দেখা যাক।



মনে করা যাক আমাদের কাছে একটা কুমড়া আছে। এই কুমড়াটাকে আমি যদি মাঝ দিয়ে সমান দুভাগ করে ফেলি, তাহলে দুইটা অংশ হয়ে গেল এখন। একটা 1/2, অন্যটাও 1/2। একটা 1/2রেখে দিলাম। এখন বাকি যে 1/2টা আছে এটাকে যদি আমি আবার মাঝখান দিয়ে সমান দুই ভাগে ভাগ করি তাহলে একটা হবে 1/2, আরেকটা 1/4। এখন এই একটা 1/4রেখে দিলাম। আরেকটা যে 1/4আছে এটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করি, কী হবে? 1/8 এবং1/8। এই1/8কে যদি আমি আবার সমান দুই ভাগে ভাগ করি, তাহলে পাওয়া যাবে 1/16 এবং 1/16। তাহলে যদি আবারো ঐ একটা 1/16 কে ভাগ করি, এমন করতে, করতে, করতে, করতে আমি কোন

পর্যন্ত ভাগ করতে পারব? অ-সী-ম পর্যন্ত এগুলোকে আমি ভাগ করেই যেতে পারব। এখন আপনি চিন্তা করুন, যদি সমস্ত টুকরা এখন এক সঙ্গে যোগ করা যায়, তাহলে আমরা কয়টা কুমড়া পাবো? একটা কুমড়াই পাবো। আমি কি বেশি পাবো? না। তার মানে এই অসীম পর্যন্ত যোগফল, তার মান কিন্তু 1। এখান থেকে জিনিসটা কে সুন্দর করে বোঝা যায়। অসীম পর্যন্ত যোগ করেও একটা নির্দিষ্ট মান পাওয়া, এই ব্যাপারটাকে আসলে বলে convergence বা অভিসৃতি।

তো অসীম নিয়ে বলতে গেলে একজন মানুষের কথা না বললেই নয়। তিনি হচ্ছেন সেট থিওরির জনক *জর্জ ক্যান্টর*। তিনি হচ্ছেন প্রথম মানুষ, যিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন এই পৃথিবিতে অসীম শুধু একটা নয়, পৃথিবীতে অসীম ধরনের অসীম সংখ্যক অসীম আছে! জর্জ ক্যান্টরের মৃত্যু হয় একটি মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রে। আসলে সেই সময়কার গণিতবিদগণ তাকে সুযোগ পেলেই অপমান করতো, বড় বড় গণিতবিদেরা তার ধারণাগুলোকে এক ফোঁটা মেনে নিত না, হয়তো সেই কষ্ট থেকেই বেচারা...! যাহোক তাঁর ধারণাগুলো খুবই চমৎকার ছিল। তিনি বললেন, আসলে কিছু অসীম আছে *গণণাযোগ্য অসীম* আর কিছু অসীম আছে *অগণণাযোগ্য অসীম*। কী রকম? এইবার ব্যাপারটাকে বোঝানো যাক। গণণাযোগ্য অসীম আসলে তেমন কিছু না। ধরা যাক আমাদের কাছে একটা সেট আছে, যার মধ্যে আছে পৃথিবীর সকল স্বাভাবিক সংখ্যা বা natural number। 1 থেকে বড় যত পূর্ণসংখ্যা আছে, সেগুলো সবাই মিলে একটা স্বভাবিক সংখ্যার সেটা তৈরি করে। এই সেটকে n দিয়ে লেখা হয়। আমরা লিখতে পারব

$$N = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9....\} \qquad 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10$$

এমন করতে করতে আমরা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারব? এর আসলে শেষ নেই, তাই এটা একটা অসীম সেট। কিন্তু এই সেটের উপাদানগুলোকে গোনা যায়। ৭ নম্বর উপাদান কে, সেটা কিন্তু আমরা হুট করে বলে দিতে পারব। এজন্য এটা গণনাযোগ্য অসীম (Countably infinite set)। Countably infinite-কে আরেক ভাবে চিন্তা করা যায়। আমরা যদি যেকোন একটা উপাদান নিয়ে ঠিক এর পরেরটা কত এটা বলতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে এটা গণনাযোগ্য। যেমন আমি নিলাম ১০, এর পরেরটা কত? আমরা জানি এটা ১১। ইচ্ছেমতো নিলাম ১০৫, এর

পরেরটা কত? আমরা জানি এটা ১০৬। [চাইলে একই সেটকে অন্য অনেকভাবে সাজানো যায়, তবে অন্তত একভাবে সাজানো যাবে, যেখানে কার পরে কে আছে সেটা বলা যায়! যেমন ঐ একই সেটকে আমরা ১,৩,৫,২,৪,৬,৭,৯,১১,৮,১০,১২ এভাবে সাজাতে পারি। তখনও চিন্তাশীল মানুষেরা একটু তাকালেই বুঝে যাবে ৬ এর পর ৭ আসবে, ৭ এর পর ৯...]। তো এইরকম কার পরে কে, এটা যদি আমি বার বার বলতে পারি, সেই সেটটা হবে Countably infinite। আর যেখানে এই কাজটা করা যায় না, সেটা হচ্ছে অগণণাযোগ্য বা Uncountably infinite। কী রকম? ধরা যাক, বাস্তব সংখ্যার সেট। আমি যদি আপনাকে বলি, বাস্তব সংখ্যার সেটের মধ্যে নিলাম 1। এই 1 এর পরের বাস্তব সংখ্যাটা কত? আপনি বলবেন 1.0000 হ্যাঁ 0, তার পরে 0 এবং তার পরে 1, মানে 1.0000001। হলো না। আরেক জন বলতেই পারে আমি তার মাঝখানে আরো 100 টা 0 বসালাম। সেটা তো আরো ছোট হয়ে গেল, সেটা 1 আর 1.0000001 এর মধ্যে পড়বে। অর্থাৎ ১ এর ঠিক পরেরটা কত সেটা কিন্তু আপনি কিছুতেই বলতে পারছেন না! তাই এই যে বাস্তব সংখ্যার সেট এটা আসলে Uncountable।

Countable সেট আর কী কী হতে পারে? এর মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর যত বর্গ সংখ্যা আছে তারা Countably infinite সেট । কারণ প্রথমটা ধরা যাক 1। তার পরের বর্গ সংখ্যাটা 4। তার পরেরটা হচ্ছে 9। এক্ষেত্রে পরেরটা কিন্তু আমরা সবসময়ই বলতে পারি। এরকম করে পৃথিবীতে যত মৌলিক সংখ্যা আছে তারাও Countable। প্রথমটা 2, তার পরেরটা 3, এভাবে 5, 7,তারপর 11, এরকম করে করে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারব। এরাও Countable। আর Uncountableগুলোর মধ্যে কারা কারা আছে? যেমন আমি একটু আগেই বলেছি, পৃথিবীতে বাস্তব সংখ্যা যতগুলো হতে পারে, সেটার সেটটা Uncountable। অমূলদ সংখ্যার সেটগুলো Uncountable । একটা সরল রেখাংশ নিই, এই রেখাংশের মধ্যে কতগুলো বিন্দু আছে, সেটাও আসলে একটা Uncountable infinite। তো Countable এবং Uncountable এই দুই ধরনের infinite সেট দিয়ে অনেক মজার চিন্তা করা যায়, যেগুলো আমাদের খালি চোখে আসলে বিশ্বাস হবে না। যে রকম আমরা প্রমাণ করে ফেলতে পারি যে, একটা ছোট রেখাংশের

ভেতরে যতগুলি বিন্দু আছে, একটা মানুষের শরীরে exactly ততগুলো বিন্দু আছে। একটা ছোট রেখাংশের ভেতরে যতগুলো বিন্দু আছে, এই পুরো মহাবিশ্বে ততগুলোই বিন্দু আছে। আমার শরীরে যতগুলো বিন্দু আছে , আরেকটা মানুষের শরীরে exactly ততগুলোই বিন্দু আছে। এক এক মিল দেখিয়ে খুবই চমৎকার করে এই প্রমাণগুলো করে ফেলা যায়। [আগ্রহীরা স্নেহভাজন অভীক রায়ের লেখা 'ম্যাথোস্কোপ' বইটি পড়ে ফেলতে পারেন!]

যাই হোক, অসীম আসলেই একটা চমৎকার বিষয়। আমরা অসীম নিয়ে আর কথা বাড়াবো না। আমরা এই পর্বটা শেষ করবো একটা সমস্যা দিয়ে। আগের সমস্যাগুলো পরে কখনো বোঝানো যাবে। মনে করুন, আপনার কাছে 10 টা মোহরের থলে আছে। ঐ যে আলিফ লায়লাতে যেরকম আমরা দেখতাম মোহরের থলে, সেইরকম! মোহর না বলে আমরা কোন স্বর্ণমুদ্রাও চিন্তা করতে পারি। মনে করুন এরকম ভাবে আমাদের কাছে 10-টা থলে আছে। সেই 10-টা থলের মধ্যে প্রত্যেকটাতে 10 করে স্বর্ণমুদ্রা আছে, যেগুলো দেখতে একেবারেই এক রকম। এবং প্রত্যেটার ওজন 10 গ্রাম করে। শুধুমাত্র একটা থলের মধ্যে যে 10-টা স্বর্ণমুদ্রা আছে, তাদের প্রত্যেকটার ওজন 9 গ্রাম করে। মানে এগুলোতে ভেজাল আছে। তার মানে বাকি যে 9-টা থলে আছে তাদের প্রত্যেকটাতে 10-টা করে স্বর্ণমুদ্রা আছে এবং প্রত্যেকটার ওজন 10 গ্রাম করে। শুধুমাত্র 1 টাতে যে 10-টা আছে তাদের ওজন 9 গ্রাম করে। এখন আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে একটা ডিজিটাল ওজন মাপার যন্ত্র দেওয়া হলো। অর্থাৎ এটার উপর কিছু রাখলেই ওখানে সুন্দর করে ওজন উঠে যাবে। এই ওজন মাপার যন্ত্র ব্যবহার করে, মাত্র 1 বার ওজন করে, আবার বলছি মাত্র একবার ওজন করে আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে, কোন থলিটার মধ্যে কম ওজনের বস্তুগুলো আছে। আপনি যদি খুব ভাগ্যবান হন, তাহলে দেখবেন আপনি যেটা তুলেছেন সেখানেই 9 গ্রাম ওজনের, তাহলে তো বুঝেই গেলেন। আর যদি আপনি ভাগ্যবান না হন তাহলে তো ওজন দেখে বুঝবেন না। তাহলে তো আপনাকে অন্য একটা উপায় বের করতে হবে। এটাই হচ্ছে সমস্যাটা। চিন্তা করুন, কিভাবে একবার মাত্র ওজনে বের করা যায়, সেই কালপ্রিট থলেটা কোনটা। চিন্তা করতে থাকুন, কারণ চিন্তাই ভবিষ্যতের পথ দেখায়!

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ৯

ডিজে পিথাগোরাস

আজ আমি যে গল্প বলব সত্যি কোন গল্প না।
পুরো গল্পের বেশির ভাগই নিছক আমার কল্পনা।
আইডিয়া সব সত্যি তাই এর গুরুত্ব অল্প না।
না! না!।
পিথাগোরাস মহামুনি,
চলো তার গল্পটা শুনি।
আড়াই হাজার বছর আগে
স্যামোস দ্বীপের মধ্যভাগে।
জন্ম নেন এই মহান লোক
ছিল 'সংখ্যা'তে খুব ঝোঁক।
স্বর্গ, মর্ত্য, আত্মাও নাকি সংখ্যা মেনে চলে।
শুনে অবাক লোকেরা যোগ দিল তার দলে।
জ্ঞানের প্রেমিক তিনি নিজেকে বলেন,
জ্ঞান সন্ধানে কত দেশ পাড়ি দেন।
জ্ঞান পিপাসা নিয়ে,
বুকেতে আশা নিয়ে,
সাগর পাড়ি দিয়ে,
চলে যান মিশরে।
কোথায় কি জ্ঞান আছে,
কোথায় wiseman আছে,
ছুটে যান তার কাছে,
শেখেনে প্রাণ ভারে।
তো একদিন রাতে,
মিশরীয়দের সাথে,

কী করলেন গুরু?
গল্পের তো সেখানেই শুরু।

This is a Pythagoras production।
সরো তোমরা সরো,
তোমরা কী যে কর?
শুধু জন্মাও আর মরো।
বলি, কিছুতো একটা ধরো।
তোমরা সংখ্যা বোঝ না।
তোমরা সত্য খোঁজ না।
নেই জ্যামিতির জ্ঞান,
শুধু করো প্যান প্যান।
আর করো কূটনামি,
না বুঝেই পাকনামি।
উফ!!! বোর হয়ে গেলাম আমি।
আমি বলতে পারি আরো,
তার আগে বলো, লম্ব আঁকতে পার?
সেই কথা শুনে একজন মিটিমিটি হাসে।
সেও যে লম্ব আঁকতে বড় ভালবাসে।

– পিথাগারাস সাহেব!!!
আমরা গরিব হতে পারি কিন্তু জ্ঞানশূন্য নই।
লম্ব ক্যামনে আঁকতে হয়, দেখিয়ে দেবই।
আমাদের আঁকার পথ বড়ই অদ্ভুত!
বারো গিটের দড়ি দিয়ে আঁকব নিখুঁত।
অ্যাঁ! বারো গিটের দড়ি দিয়ে লম্ব ক্যামনে আঁকো?
এতকিছু জানি আর এইটা জানি নাকো।
দেখাও তো দেখি কোথায় দিচ্ছ গোঁজামিল?
ভুল জ্ঞান দেয়া কিন্তু পাপের শামিল।
না না গুরু ভয় নেই,
শেখাবো না ভুল।
বারো গিটের এ নিয়ম বড় Beautiful।

একখানা দড়ি নিয়ে, সমান সমান দূরে,
বারো খানি গিট দিয়ে আসবেন ঘুরে ঘরে।
দুই মাথা বন্ধ, জোড়া দিয়ে রাখা।
যন্ত্র এবার প্রস্তুত, রইল বাকি আঁকা।
এমনভাবে এবার টেনে ধরুন দড়িটাকে,
একপাশে চারখানা গিট যেন থাকে।
অন্যপাশে পাঁচ খানা, আরেক পাশে ছয়।
পুরোটা দেখতে যেন ত্রিভুজের মতো হয়।

দাঁড়াও! দাঁড়াও! দাঁড়াও,
চার, পাঁচ, ছয় মিলে পনেরো তো হয়।
বারোর হিসাবটাতো মিলবার নয়।

না না গুরু ঠিকই আছে, দেখুন ভালো করে।
কোণারগুলো দুই বাহুতে কমন কিন্তু পড়ে।
এরই মধ্যে লম্ব কিন্তু আঁকা হয়ে আছে,
চার গিট আর পাঁচ গিটের দুই বাহুর মাঝে।

অ্যাঁ! কই, তাইতো দেখি আজব ব্যাপার, দেখি নিতো আগে।
এমন কেন হলো মনে বড়ই প্রশ্ন জাগে!!

সেই প্রশ্নেরই উত্তরটাই খুঁজতে হয়তো গিয়ে,
পিথাগোরাস তার সেই উপপাদ্য গেলেন পেয়ে।
সত্যি আজও এই পৃথিবী নানান রঙের খেলা,
তুচ্ছ ভেবে কিচ্ছুটিকে কোরো না অবহেলা।

সুপ্রিয় দর্শকমণ্ডলি, এতক্ষণ আপনারা দেখলেন ছোটদের র‍্যাপ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 'ছন্দে, দ্বন্দ্বে, আনন্দে'। পরিবেশন করলেন ছোট্ট বন্ধু পিথাগোরাস।

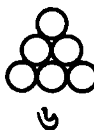
যাইহোক এবার আসল কথায় আসি। এই যে একটু আগে আমি বলেছিলাম, বারো গিটের দড়ি দিয়ে লম্ব আঁকা। আসলেই পদ্ধতিটা খুবই সুন্দর। এবং এই পদ্ধতিটা পিথাগোরাসের উপপাদ্য আবিস্কৃত হওয়ার ও বহু আগের থেকে মানুষ জানত। হয়তোবা সেখান থেকে পিথাগোরাস তার উপপাদ্যের Idea পেলেও পেয়ে থাকতে পারেন। আমরা নিশ্চিত করে আসলে বলতে পারিনা। তো এই যে পিথাগোরাস যখন এরকম জিনিটা দেখেছিলেন, হয়তো তার মাথায়ও প্রশ্ন এসেছিল যে কেন ১২ গিটের

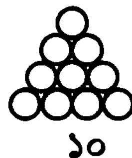
একটা দড়ির একপাশে চার গিট আরেক পাশে পাঁচ গিট ও আরেক পাশে ছয় গিট থাকলে সেটা দিয়ে লম্ব আঁকা যায়। আমরা Normally লক্ষ করি যে, একপাশে যদি ৪ গিট থাকে তাহলে আসলে মাঝখানে দূরত্ব কিন্তু আছে ৩ একক। দুই গিটের মাঝখানের দূরত্বকে আমি ১ একক চিন্তা করি, তারপরে আর ১ একক, আর ১ একক। অর্থাৎ এইপাশে ৩ একক। ঠিক একই ভাবে এদিকে দূরত্ব আছে ৪ একক, আর অন্যদিকে ৫ একক দূরত্ব আছে। এখন ৩, ৪, ৫ এরকম দূরত্বের বাহু নিয়ে আমরা যদি একটা ত্রিভুজ বানাই, তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে। এই রকম একটা কিছু আগের থেকে মানুষজন জানত। তো পিথাগোরাস এটার থেকে ভাবার চেষ্টা করলেন, কেন ৩, ৪, ৫ থাকলে এমন হয়! ৩, ৪, ৫ এর মধ্যে সর্ম্পকটা কোথায় আসলে। এরকম কি আমি পর পর ৩টা সংখ্যা নিলেই হবে। দেখিতো, ৫, ৬, ৭ নিয়ে। না, তাতো মেলে না। তাহলে ৩, ৪, ৫ এর মধ্যে আর কি কি সর্ম্পক আছে। হয়তো তিনি তখন দেখেছিলেন, $৩^২$ মানে ৯, আর $৪^২$ মানে ১৬। এই দুটো যোগ করলে পাওয়া যায় ২৫। মানে $৫^২$ । তাহলে ২টার^২ যোগ করে আরেক টা^{২} সমান। এরকম আর কি কি আছে। আর কি কি আছে, এরকম আর আছে ৫, ১২, ১৩। $৫^২$ মানে ২৫। তার সাথে $১২^২$ যোগ করলে ১৪৪। ২৫ আর ১৪৪ যোগ করলে হয় ১৬৯ মানে $১৩^২$ । $৫^২ + ১২^২=১৩^২$ । এখন তিনি একবাহু ৫, একবাহু ১২ আরেক বাহু যদি ১৩ নেন, তখনও তিনি দেখতে পেলেন হ্যাঁ! এটা সমকোণী ত্রিভুজ হচ্ছে। তখন হয়তো তিনি বললেন, ও এই কথা! দুইটা বর্গ যোগ করলে যদি আরেকটা বর্গের সমান হয়, তাহলেই সেই সংখ্যাগুলোর সমান বাহু নিয়ে সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা যায়। এটাকেই এখন আমরা বলি পিথাগোরাসের উপপাদ্য।

ত্রিভুজ সংখ্যা


১


৩


৬

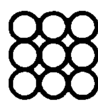
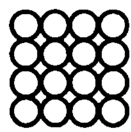

১০

না, আসলে ব্যাপারটা এরকম ভাবে আসেনি। এটা মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত যে, পিথাগোরাস হয়তো নিজে এই উপমাটা করেনি। পিথাগোরাস তার নিজের চিন্তা ভাবনাগুলোকে নিয়ে, একটা স্কুল বা একটা ভাতৃসংঘের মতো খুলেছিলেন। যেখানে তার অনেক শিষ্য ছিল, অনেক মতাদর্শী ছিল। তারা যেটা করতো, তারা পিথাগোরাসের চারপাশে থাকতো এবং তার কাছ থেকে জ্ঞান নেয়ার চেষ্টা করতো। এবং তারা নিজেরাও গবেষণা

করতো। তো তারা হয়তো নিজেরা (কিংবা তাদের মধ্যে কোন একজন শিষ্য) গবেষণা করে উপপাদ্যটা বের করেছিলেন। কিন্তু এই উপপাদ্যটা তারা কোত্থেকে পেয়েছিল? এটার ব্যাপারে আমি একটু আগে যে ব্যাখ্যাটা বলেছি, তার থেকেও আরেকটা গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা আছে, সেটা হচ্ছে 'নমন' (Gnomon) সংখ্যার ব্যাখ্যা। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়টাতে পিথাগোরাসের যারা শিষ্যরা ছিলেন তারা Figurative Numbers নিয়ে খুব চিন্তা করতেন। Figurative Numbers হচ্ছে সেসব সংখ্যা যাদেরকে কোন ছবির মতো করে দেখা যায়। কি রকম? কিছু সংখ্যাকে তারা বলতেন 'ত্রিভুজ সংখ্যা'। যেগুলোকে ত্রিভুজে সাজানো যায়। কোনগুলো? ১, ৩, ৬, ১০, ১৫, ২১ এরকম করে যে সংখ্যাগুলোকে ত্রিভুজাকারে সাজানো যায় তাদেরকে বলে ত্রিভুজ সংখ্যা। কিছু সংখ্যাকে তারা বলতো বর্গ সংখ্যা। তাহলে বর্গ কোনগুলো? ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫, ৩৬ এমন সংখ্যাগুলো। এগুলোকে সুন্দর করে বর্গকারে সাজানো যায়। এইযে এ সংখ্যাগুলো ছিল এবং তার পাশাপাশি ছিল 'নমন (Gno mo n) সংখ্যা'। নমন সংখ্যা কী? একটা বর্গক্ষেত্র চিন্তা করুন। এই বর্গক্ষেত্র থেকে যদি আমরা আরো একটা বর্গক্ষেত্র কেটে বাদ দিয়ে দেই, উপরে L এর মতো যেই অংশ থাকে সেটাকে বলে "নমন'। তাহলে নমন সংখ্যা কোনগুলো সেগুলো দেখবো। একটা বর্গে কোণ বরাবর একদম উপরের বাহু দুইটা দেখা যাচ্ছে, এখান যতগুলো সংখ্যা আছে সেগুলো কে নমন সংখ্যা বলে। এটাই হচ্ছে নমন সংখ্যা। কি রকম? একের মধ্যে তো একটাই আছে ১।

বর্গ সংখ্যা

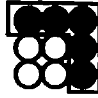
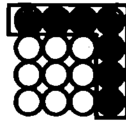
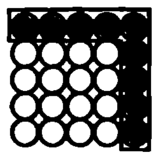


১ ৪ ৯ ১৬

নমন সংখ্যা



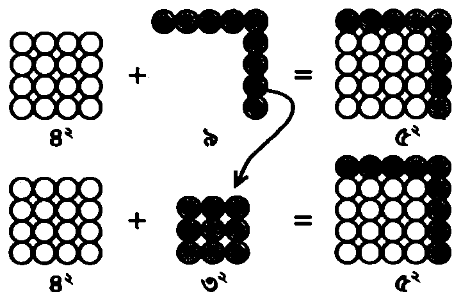





১ ৩ ৫ ৭ ৯

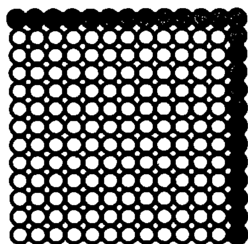
৪ একটা বর্গসংখ্যা। ৪ এর মধ্যে নমন হচ্ছে ৩। দেখুন উপরে মোট ৩টা সংখ্যা আছে। ৩ এর বর্গ হলো ৯। ৯ এর মধ্যে ৫ হচ্ছে নমন সংখ্যা। আবার ৪×৪=১৬। ১৬ এর মধ্যে ৭ হচ্ছে নমন সংখ্যা। ছবিতে দেখুন,

উল্টো L এর মতো জায়গাটায় ৭ টি সংখ্যা আছে। নমন সংখ্যা কারা, এবার একটু ভালো করে দেখুনতো— ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩— একটু চেনা চেনা লাগছে না?

আসলে এগুলো হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা। সকল ধনাত্মক বিজোড় সংখ্যাই হচ্ছে নমন সংখ্যা। তার মনে তারা বিজোড় সংখ্যাগুলোকে নমন সংখ্যার মতো করে চিন্তা করতো। এখন একটা দারুণ জিনিস খেয়াল করুন। মনে আছে তো "নমন সংখ্যা" নিয়ে তারা কিভাবে চিন্তা করেছিল, একটা বর্গ থেকে আরেকটা বর্গ বাদ দিয়েইতো পাওয়া গিয়েছিল, তাই না? তার মানে উল্টো করে বললে, একটা বর্গের সাথে আমরা যদি নমন সংখ্যা যোগ করে দেই, তার ঠিক পরের বর্গটা পাওয়া যাবে। ছবিটার দিকে আবার তাকান। চিন্তা করুন ২^{২}, এইযে তার সাথে যদি আমি আরেকটা নমন ৫ যোগ করে দেই, তাহলে ৩^{২} পেয়ে যাচ্ছি আমরা। এই ৩^{২} এর সাথে যদি আমরা আরেকটা "নমন সংখ্যা" ৭ যোগ করে দেই, তাহলে ৪^{২} পেয়ে যাচ্ছি আমরা। ৪^{২} এর সাথে যদি আমরা আরেকটা নমন ৯ যোগ করে দিই, ৬^{২} পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে একটা বর্গ তার সাথে নমন যোগ করে দিলে আরো একটা বর্গ পাওয়া যায়। এখান থেকে পিথাগোরাসের শিষ্যদের মাথায় অন্য একটা আইডিয়া এলো। তারা তো জানে যে নমন হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা। এখন কিছু কিছু বিজোড় সংখ্যা আছে, যারা নিজেই বিজোড় আবার বর্গ সংখ্যা ও। যেমন ৯। সে বিজোড়, আবার বর্গও। ৯ একটা নমন সংখ্যাও আবার তাকে একটা বর্গের মতো করেও সাজানো যায়। এখন তাহলে করে চিন্তা করুন তো, ৪^{২}, এই যে ৪^{২} আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সাথে আমরা যদি ৯ লাগিয়ে দেই, তাহলে কিন্তু ৫^{২} পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে একটা বর্গ সংখ্যার সাথে, আমরা যদি এমন একটা বর্গ নমন সংখ্যা যোগ করি, যে বর্গও হবে আবার নমনও হবে– তাহলেই তো আরেক টা বর্গ সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ৪^{২}, তার সাথে ৯ যোগ করলেই আমরা পাচ্ছি ২৫। এই যে ৪^{২} এবং ৯ মানে ৩^{২} = ৫^{২}। ৪^{২} এবং ৩^{২} যোগ করলে ৫^{২} এটা একটা দারুণ ব্যাপার।



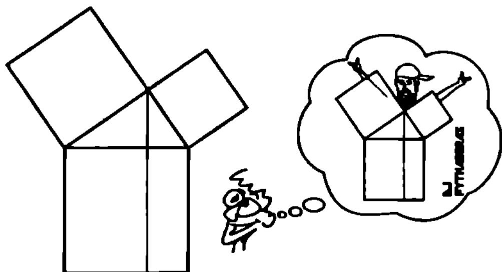
দুইটা বর্গের যোগফল আরেকটা বর্গ, এরকম অদ্ভুত ব্যাপার আর কী হতে পারে? অবশ্যই পারে। চলুন, আবার আরেকজনকে খুঁজি যে বিজোড় আবার বর্গ। তাহলে ৯ এর পরে এমন আর কে আছে? আছে ২৫। ২৫ কে আমরা নমনে সাজাবো, নমনে সাজালাম ২৫ কে। এখন ২৫ কে দেখা যায় এভাবে উপরে ১২, কোণায় ১ আর ডানে ১২। তাহলে ঐ নমনের নিচের জায়গায় ১২ এর একটা বর্গ আমি লাগাতে পারব। তাহলে ১২ এর বর্গ, এবং তার সাথে এই ২৫ যোগ করেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি ১৩ এর বর্গ। $১২^{২} + ২৫ = ১৩^{২}$, কিন্তু ২৫ নিজেই আবার $৫^{২}$। তাহলে $১২^{২} + ৫^{২} = ১৩^{২}$।



$১২^{২} + ২৫ = ১৩^{২}$
$১২^{২} + ৫^{২} = ১৩^{২}$

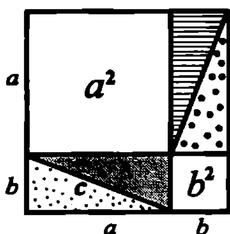
আমরা নতুন আরো একটা 'জিনিস' পেয়ে গেলাম। আমরা আরো কি বের করতে পারি? এই আইডিয়া থেকে আমরা ইচ্ছেমতো এমন অনেকগুলো বের করতে পারব। দেখুন এর পরে আর কে আছে, যে বিজোড় এবং বর্গ? সাত সাততা ৪৯। ৪৯ কে আমরা নমনে যদি রাখি, উপরে ২৪টা, ডানে ২৪টা, আর কোণায় ১টা। তাহলে এখানে আমি বর্গ লাগাতে পারব কী আকারের? ২৪×২৪ আকারের একটা বর্গ লাগাতে পারব। তাহলে $২৪^{২}$ এর সাথে যদি ৪৯ নেই, $২৫^{২}$ পেয়ে যাব। তার মানে আমি পাচ্ছি $২৪^{২} + ৭^{২} = ২৫^{২}$। আমরা আরো একটা নতুন 'জিনিস' পেয়ে গেছি। এই যে নতুন 'জিনিস' বলছি আমি, এগুলো আসলে একেকটা পিথাগোরিয়ান ত্রয়ী। ৩, ৪, ৫ একটা সুন্দর ত্রয়ী। ৭, ২৪, ২৫ একটা সুন্দর ত্রয়ী। ১২, ৫, ১৩ এ রকম আরও একটা ত্রয়ী। তো এরকম ভাবে অনেক ত্রয়ী আপনারা ইচ্ছা করলে বের করে ফেলতে পারবেন। [ত্রয়ী বের করার একটা সাধারণ বীজগাণিতিক সূত্র আছে $(a^2-b^2)^2 + (2ab)^2 = (a^2+b^2)^2$ । পূর্ণসংখ্যায় a আর b এর নানান রকম মানের জন্য অনেক ধরনের ত্রয়ী পাওয়া যাবে এখান থেকে। তবে আমরা যেটা উপরে দেখিয়েছি সেটার বীজগাণিতিক প্রকাশ এমন: $(2n^2+2n)^2+(2n+1)^2= (2n^2+2n+1)^2$, যেখানে $n=1,2,3\cdots$। এই জটিল সমীকরণে মান বসানোর থেকে দেখে দেখে বের করা কত সোজা , তাই না?]

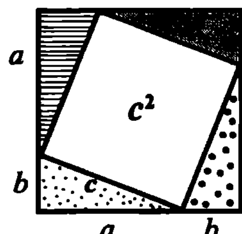
এই ধরনের ত্রয়ীগুলো দিয়ে ত্রিভুজ আঁকার সময়, পিথাগোরাসের শিষ্যরা লক্ষ্য করেছিল যে এরা সবসময় সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করে। সেখান থেকেই পিথাগরাসের উপপাদ্য এসেছে বলে ধারণা করা হয়। তারা কিন্তু শুধু লক্ষ্য করেছিল, এবং গাণিতিকভাবে এটাকে প্রকাশ করেছিল। কোন প্রমাণ কিন্তু তারা দিয়ে যায়নি। তাহলে পিথাগোরাসের উপপাদ্যটা যে সত্যি, সেটা মানুষ কিভাবে প্রমাণ করেছিল? সত্যি কথা বলতে গেলে, পিথাগোরাস উপপাদ্যের শত শত প্রমাণ আছে। আমরা দুটো প্রমাণ দেখেছিলাম অষ্টম শ্রেণির বইয়ের মধ্যে। তার মধ্যে একটা দেখতে ছিল এই রকম:



এটা দেখলেই আমার কাছে মনে হতো যে জামা পরে আছে একটা মানুষ! পিথাগোরাসের উপপাদ্যের এটাই ছিল প্রথম প্রমাণ আর এই প্রমাণটা এটা করেছিলেন 'ইউক্লিড'। আমি বলি এটা ইউক্লিডের জামা পদ্ধতির প্রমাণ। এখানে এই প্রামাণটা আমি বোঝাব না।

পিথাগোরাসের উপপাদ্যের খুব সুন্দর একটা প্রমাণ আছে, যেটা শুধু ছবি দেখেই বোঝা যায়।





ফাঁকা অংশ = ফাঁকা অংশ

$$a^2 + b^2 = c^2$$

দুইটা সমান সমান বর্গ আছে এখানে, দুইটারই এক বাহুর দৈর্ঘ্য a+b করে। প্রথম বর্গের ভেতরে দেখা যাচ্ছে মোট চারটে ত্রিভুজ আছে। প্রতিটা ত্রিভুজের অতিভুজ c আর বাকি দুইবাহু a,b । দ্বিতীয় বর্গের ভেতরে এই চারটে ত্রিভুজকেই শুধু সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাহলে প্রথম বাক্সে যে ফাঁকা অংশ থাকবে , সেটা দ্বিতীয়

বাক্সের ফাঁকা অংশের সমান হবে। প্রথম বাক্সে ফাঁকা অংশ $a^2 + b^2$ আর দ্বিতীয়টাতে ফাঁকা অংশ c^2। তারমানে

$$a^2 + b^2 = c^2$$

কী সুন্দর করে দেখে দেখে প্রমাণটা করে ফেললাম (সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: এই প্রমাণ পরীক্ষার খাতায় ব্যবহার করিবেন না, করিলে শূন্য নম্বর প্রাপ্তিজনিত কষ্টে ভুগিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। যদিও ইহা সম্পূর্ণ সঠিক, আমাদিগের অধিকাংশ শিক্ষকবৃন্দ এত স্বল্প পরিশ্রমে নম্বর দিতে ভালবাসেন না)! ক্লাস এইটে আরেকটা প্রমাণ ছিল মনে আছে। যেটাকে আমরা বিকল্প প্রমাণ বলতাম। এটা ছিল ট্রাপিজিয়াম দিয়ে। সেই যে এ প্রমাণটা, সেটা কে করেছিল জানেন? ওটা করেছিলেন আমেরিকার ২০তম প্রেসিডেন্ট "জেমস্ এ. গারফিল্ড"। আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট, তিনি একটা উপপাদ্যের প্রমাণ করেছিলেন, যেটা সারা পৃথিবীর ছেলে-মেয়েরা ব্যবহার করে। কী দারুণ একটা ব্যাপার! আমাদের দেশে আমরা এখনো আমাদের ঠিক ঐ উপরের পর্যায়ের মানুষগুলোতে আমরা এমন গণিতমনা কিংবা এমন বিজ্ঞানমনা মানুষ খুব বেশি পাইনি আসলে। কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখি, এক সময় যখন অনেক গণিত জানা মানুষ, বিজ্ঞান জানা মানুষ ঐ জায়গাগুলোতে থাকবে, তখন আমাদের দেশটা অনেক অনেক সুন্দর হবে। আমরা একটা সুন্দর সময়ের অপেক্ষায় এই পর্বটা শেষ করছি।

গণিতের রঙ্গে: পর্ব ৯$\frac{1}{2}$

তেমন কিছু ৯

একটা ছোট গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। একটা পিচ্চি ছেলে, তার মাছ পোষার খুব শখ। তো সেই পিচ্চি ছেলেটা একবার বাজার থেকে দুইটা মাছ কিনে নিয়ে এসেছে। তো কিনে আনার পরে একটা মাছের নাম রেখেছে 'একটা' আরেকটার নাম রেখেছে 'দুইটা'। তখন তার বাবা জিজ্ঞাসা করল কিরে মাছের এরকম নাম রাখলি কেন। সে বলল 'আব্বা, যেন একটা মরলেও দুইটা থাকে'। তো সেই পিচ্চিটা একবার গেল পাগলা গারদে বেড়াতে। সেখানে গিয়ে দেখে যে, তিনটা পাগল নাকি ভাল হয়ে গেছে। ডাক্তার তাদের পরীক্ষা করছে। প্রথমেই প্রথম পাগলকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি বলুনতো ৩ আর ২ গুণ করলে কত হয়? সে ছিল উদাস পাগল। সে বলে ৩ আর ২ গুণ দিলে হবে....আকাশ। তার কথা শুনে তো ডাক্তারের মাথা খারাপ। ডাক্তার বলল, কে আছিস, ওকে আগের জায়গায় নিয়ে যা। তারপর দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি বলুনতো ৩×২ কত হয়? সে ছিল খুব সিরিয়াস পাগল, প্রকৃতিবিদ। সে বলল, ৩×২ হয় পাখি। ডাক্তারের তো মেজাজ খারাপ। তিনি বললেন, আপনারো মাথা ঠিক নেই, যান। তৃতীয়জন যিনি, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো ৩×২ কত হয়। তিনি খুব বলিষ্ঠকন্ঠে উত্তর দিলেন, তিন দুগুণে ছয়। ডাক্তার বলল, বাহ, আপনিতো ভালো হয়ে গেছেন। আপনি কিভাবে পারলেন? সে বলল, ৩×২ এটাতো খুব সোজা ব্যাপার আকাশ থেকে পাখি বিয়োগ করলেই তো পাখি থাকে! উত্তর শুনে তো ডাক্তারের মাথা আরো খারাপ!

তো এরকম আরেকজন পাগলের কথা এখন বলি। ১৭ নভেম্বর ১৯১৭, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একজন সৈনিক ছিলেন আর জে ব্লক। ছুটিতে বাড়িতে এসেছেন। বাড়িতে এসে রাতে খাবারের পরে, তার ছোট ভাই

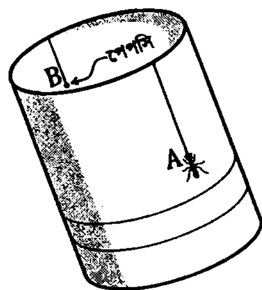
জর্জেস ব্লক এবং চাচা-চাচিকে গুলি করে মেরে ফেললেন! তাকে প্রচণ্ড মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় ধরে নিয়ে তাকে মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই মানসিক হাসপাতালে তিনি ৩১ বছর কাটালেন। তো সেই ৩১ বছরে তিনি তার গণিত নিয়ে সাধনা করে গেলেন। তিনি গণিত নিয়ে গবেষণা করলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি এত কাজ করলেন যে এক সময় তার মৃত্যুর এক বছর আগে তাকে বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। তো এই গণিতবিদ আর জে ব্লক কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কেন আপনার সেই ছোট ভাই আর চাচা-চাচিকে হত্যা করলেন। তো তখন বলেছিলেন যে ওনারা তখন প্রচণ্ড মানসিক অসুস্থ ছিলেন। যাইহোক, মানসিক রোগীদের কাছে আমরা অসুস্থ, আমাদের কাছে তারা অসুস্থ। এরকম মত হতেই পারে। এটাকে আপেক্ষিক মতো বলা যেতে পারে। তো আমি আসলে সেসব পাগলের কথা বলছি না।

আমি আসলে ঐ সব পাগলের কথা বলছি যাদের কে আমরা প্রায়ই সংখ্যা ভালবাসি বলে পাগল বলি। যাদের কে গণিত ভালবাসি বলে পাগল বলি। আজ আমি খুবই স্পষ্ট করে বলতে চাই, এ পৃথিবীতে সেরকম কিছু পাগল ছিল বলেই, আমাদের পৃথিবীটা আজ এতো সুন্দর। আজকে আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি, গণিতের এই সবকিছু সম্ভব হয়েছে এরকম কিছু পাগলের জন্যই। কখনো যদি আপনি আপনার চারপাশে কোন মানুষকে দেখেন যে কোন কিছুকে সে পাগলের মতো ভালবাসে। তাকে কখনোই অশ্রদ্ধা করবেন না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, সে আপনার চেয়ে ঐ কাজে বেশি দক্ষ হবে। এবং ঐ কাজটাতে আরো বেশি সাফল্য পাবে। ঐ কাজ দিয়ে সে সমাজে অনেক বড় অবদান রাখাতে পারবে। তো আমার আজকের যে পর্বটা, এটা একটা বিশেষ পর্ব। আসলে আমি একদিন এসে দেখলাম যে আমার গণিতের রঙ্গে, ১ লক্ষ বার মোটামুটি Youtube-এ দেখা হয়ে গেছে। এর মানে হচ্ছে অন্তত গড়ে ১০ জন মানুষ আমার গণিতের রঙে দেখে ফেলেছে। তার মানে ১০ হাজার মানুষের কাছে এ বার্তাটা পৌঁছে গেছে যে, গণিতকেও ভালোবাসা যায়। তো এদের মধ্যে অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে গণিত আসলে কী কাজে লাগে? খুবই ভাল একটা প্রশ্ন। কারণ আপনি যে সব গণিত চারপাশে দেখবেন, আমি আসলে যা কিছু শেখাচ্ছি গণিতের রঙ্গে, তার হয়তো ৮০ ভাগ জিনিসই আপনার কখনোই সরাসরি কাজে লাগবে না। কিন্তু সরাসরি কাজে লাগবেনা মানে এই না, যে আপনার এটা কখনোই

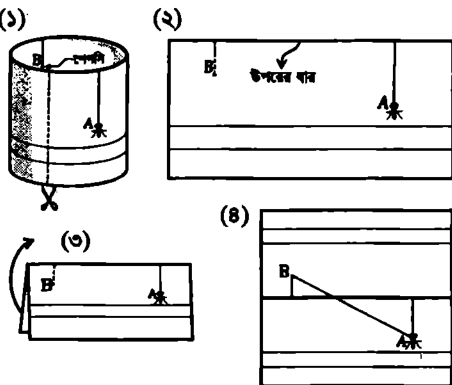
কাজে লাগবে না। কিংবা আপনাকে সেটা সাহায্য করবেনা। আপনি যত গণিত শিখছেন, আপনার চিন্তা করার ক্ষমতাটা তত বাড়বে। এবং গণিত আপনাকে আস্তে আস্তে অন্যরকম মানুষে পরিনত করবে। এটা খুব জরুরি একটা ব্যাপার। গণিতের কত অদ্ভুত অবদান আছে সেটার বর্ননা করতে গেলে বছর ফুরিয়ে যাবে, একটা বলি।

আপনারা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা অনেকেই হয়তো জানেন। তিনি Lady with the lamp বলে পরিচিত। তো নার্সিং এর ক্ষেত্রে তাকে একজন পথপ্রদর্শনকারী বলা যায়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যে অনেক বড় গণিতবিদ (এবং পরিসংখ্যানবিদ) ছিলেন এটা কি আপনারা জানেন? ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যখন আহত সৈনিকরা তার কাছে আসতো, তখন তিনি ঐ সৈনিকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতেন। কিভাবে সৈনিকেরা মারা যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ গাণিতিকভাবে তিনি গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেন। সেখান থেকে তিনি কিছু সুপারিশ করেন যে কিভাবে এ মৃত্যু হার কমানো যায়। এবং তার বিশ্লেষণের ফলে সৈনিকদের মৃত্যুহার নাকি ৪২ শতাংশ থেকে মাত্র ২ শতাংশে নেমে ছিল। তাহলে বুঝুন!

তো এই যে গণিত, এই গণিত শিখে চিন্তাকে কিভাবে উন্নত করা যায়? একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝানো যায়। একটা সমস্যা বলি আপনাদের। ধরা যাক, একটা পেপসির ক্যান আছে আমাদের কাছে কেউ একজন খেয়ে ফেলেছে, ভেতরের দেয়ালের গায়ে শুধু একফোঁটা পেপসি লেগে আছে। ধরে নিন, ক্যানের বাইরের দেয়ালে a বিন্দুতে একটা পিঁপড়া আছে। এবং ক্যানের ভেতরের দেয়ালে B বিন্দুতে এক টুকরো পেপসি লেগে আছে। গরমের দিন, পিঁপড়ার খুব পেপসি খাওয়ার শখ। তো প্রশ্ন হচ্ছে বাইরের এই a বিন্দু থেকে ভেতরের B বিন্দুতে পিঁপড়াটা যখন যাবে, কোন পথ ধরে গেলে, সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে সে ওখানে যেতে পারবে? [সতর্কীকরণ: এই পিপীলিকার এখনও মরিবার শখ হয় নাই, তাই উহার পাখা গজায় নাই, অতএব উড়িয়া যাইতে পারিবে না। পিঁপড়াটি সুপারম্যান নহে, না মানে সুপার-অ্যান্ট নহে, ক্যানের দেয়াল ফুটো করিয়া ভেতরে ঢুকিয়া যাইতে পারিবে না]।

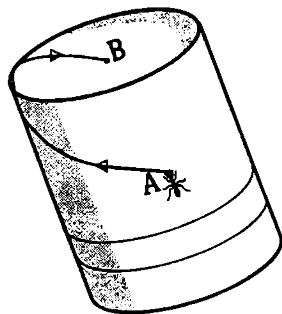


এবার আমরা চিন্তা করি। বাইরে থেকে ভেতরে যেতে অবশ্যই পিঁপড়াটাকে এই উপরের ধারটা অতিক্রম করে তারপর ভেতরে যেতে হবে। আমি দেখেছি অনেকেই এভাবে চিন্তা করেন, পিঁপড়াটা ওর জায়গা থেকে সোজা উপরে উঠে যাবে, তারপর ধারের কিনার দিয়ে হেঁটে গিয়ে B বিন্দু বরাবর যাবে। এরপর ভেতরের দিকে সোজা নিচে নেমে গেলেই হলো। এতেই হয়তো সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করা হবে। কিন্তু এটা ঠিক না। সবচেয়ে কম দূরত্বে কিভাবে অতিক্রম করতে হবে তার একটা সুন্দর একটা সমাধান আছে।



প্রথমে মনে মনে ক্যানটাকে সোজাসুজি কেটে ফেলি (উপরে ১ নং ছবির মতো)। তারপর ছড়িয়ে সমান করে ফেলি (২ নং ছবির মতো)। তাহলে দেখুন a হচ্ছে পিঁপড়ার স্থান। এবং তাকে পৌঁছাতে হবে পিছনের B বিন্দুতে। B বিন্দুটা এপাশ থেকে দেখা যাবে না, তাই ছবিতে রেখাটা ভাঙা ভাঙা করে এঁকেছি। এখন আমাদের সমস্যাটা এমন দাঁড়ালো– a থেকে শুরু করে উপরের ধার টপকে B তে যাওয়ার সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা কোনটা। এবার আমরা একটা অদ্ভুত কল্পনা করব। মনে করা যাক, টিনটা দুই লেয়ারের এবং উপরের ধারে এটা ভাঁজ হয়ে আছে। টিন কল্পনা করতে কষ্ট হলে কাগজ কল্পনা করা যায়। একটা ভাঁজ করা কাগজ আছে, যার সামনের পিঠটা দেখা যাচ্ছে ২ নম্বর ছবিতে। ৩ নম্বর ছবিতে পিছনের পিঠটা একটু উঁকি দিচ্ছে! a বিন্দু আছে সামনের পিঠে আর B বিন্দু আছে পিছনের পিঠে। এইবার কাগজটা মেলে ধরলাম (৪ নম্বর ছবি)। এখন a,B দুইটা বিন্দুই দেখা যাচ্ছে (এখন আর কোন রেখা ভাঙা ভাঙা নাই!)। এইবার চিন্তাটা খুব সহজ। a থেকে B তে যাওয়ার সবচেয়ে শর্টকাট রাস্তা কোনটা। আমি যদি একটা সরলরেখা টেনে দেই, নিঃসন্দেহে এটাই হবে সবচেয়ে কম দূরত্বে a থেকে B তে যাওয়ার পথ। এটাই সমাধান। এর চেয়ে কম দূরত্বে আপনি

কোন ভাবে পারবেন না (কারণ ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর)। কী অদ্ভুত রকম সমাধান তাই না। [ও আচ্ছা, আমরা তো সব কাটাকাটি করেছি, ছড়ানো, মেলে দেয়া এগুলো করেছি কল্পনায়। আসলে ক্যানটার উপরে সবচেয়ে কম দূরত্বের পথটা দেখতে কেমন হবে? যা যা করেছি, সব উল্টালেই রাস্তাটা দেখা যাবে। এটা মোটেই খুব সহজ দেখতে নয়, অনেকটা এই ছবিটার মতো!]।



এমন বাঁকা একটা পথের দূরত্ব কত হবে সেটা আমরা চাইলে উপরের পদ্ধতিতে চিন্তা করে সহজে বের করে ফেলতে পারি।তাহলে দেখুন, আমরা যখন চিন্তা করতে জানি কঠিন ব্যাপারগুলো সহজ হয়ে যায়!

তো এই যে গণিত, এটা আমার ভালোবাসা। আমি যতটুকু অনুভব করতে পারি তাঁর থেকে বহু কোটিগুণ তীব্রতা দিয়ে এই ভালোবাসাটাকে অনুভব করেছেন গণিতবিদেরা বহু প্রাচীন কাল থেকে। আপনারা হয়তো হাইপেশিয়ার নাম শুনে থাকবেন। হাইপেশিয়া ছিলেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার শেষ লাইব্রেরিয়ান । একজন অসামান্য নারী ছিলেন তিনি। এই নারী গণিতবিদের জীবনের শেষ সময়টা ছিল খুব কষ্টের। ধর্মান্ধরা তাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে টেনে হিঁচড়ে বের করে তার শরীরের মাংসগুলো খুবলে খুবলে তুলে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত ভালোবেসেছিলেন গণিতকেই। তিনি কোনদিন বিয়েও করেননি। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হতো যে আপনি কেন বিয়ে করেন না? তিনি তখন বলতেন যে ‘কে বলেছে আমি বিয়ে করিনি, আমি তো গণিতের সাথেই আছি, আমি সত্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ’! হাইপেশিয়া যেমন শেষ পর্যন্ত গণিতকেই ভালোবেসে গেছেন, তেমনি ভালোবেসেছিলেন এভারিস্ট গ্যালোয়া। তাকে বলা হয় এক রাতের গণিতবিদ। তিনি মারা গিয়েছিলেন ডুয়েল লড়তে গিয়ে। [ডুয়েল মানে হলো দুজন মানুষের সামনাসামনি বন্দুকযুদ্ধ, যে হারবে সে মারা যাবে, যে বেঁচে থাকবে সে জিতবে!] যার সাথে তিনি ডুয়েল লড়েছিলেন সে ছিল বন্দুকযুদ্ধে খুবই পটু। গ্যালোয়া জানতেন যে বন্দুকযুদ্ধে তিনি হেরে যাবেন এবং তিনি মারা যাবেন। এমনকি আগের রাত্রে তিনি যখন জানেন যে পরেরদিন তিনি মারা যাবেন, তিনি হয়তো অনেক ফূর্তি করে কাটিয়ে

দিতে পারতেন। তিনি কিন্তু তা করেননি। তিনি যা করেছিলেন– তিনি তার জীবনে গণিত নিয়ে যত কাজ করেছিলেন, তার সবকিছু তিনি লিখে গিয়েছিলেন। একটি চিঠি লিখেছিলেন সেই রাতে। সেই চিঠিতে দেখা যায় তিনি কয়েকলাইন পরপরই লিখেছেন, 'আমার সময় ফুরিয়ে আসছে'। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে পরেরদিন তিনি আর বাঁচবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন তার ভালোবাসাটিকে।

এই ভালোবাসাটুকুর জন্যই আমাদের সবকিছু, সমস্ত সাধনা। এই ভালোবাসাটুকু আপনাদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 'গণিতের রঙ্গে'। আপনারা যারা এতদিন আমার সাথে ছিলেন, এবং থাকবেন আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা সবাই গণিতের সাথে থাকুন। এবং ভাল থাকুন। আর হ্যাঁ! চিন্তার কথা যেহেতু বলেছি, তাহলে একটা শেষ সমস্যা দিয়ে যাচ্ছি। এই কোডটা সমাধান করার চেষ্টা করুন। বলুন দেখি এখান কী লেখা আছে? Ftgcou ctg nkmg uvctu...aqw oca pgxgt vqwej vjgk, dwv kh aqw hqnnqu vjgk vjga yknn ngcf aqw vq aqwt fguvkpa.

গণিতের রঙ্গে: ১০

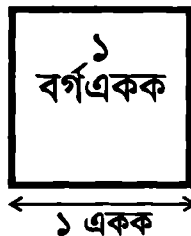
নিঃস্বার্থ গণিত– What is Math

অনন্ত জলিলের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা যারা দেখেছেন, তারা এই প্যারোডিটা বুঝতে পারবেন। প্যারোডি হলেও এ আমার মনের কথা!

"গণিত নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন অন্ত নাই। এই সব দেখে শুনে আমার হৃদয়টার কী অবস্থা হয়েছে দেখতে চাও? যখন শুনি আমার দেশের কচি কচি ছেলে-মেয়েদের কে গণিত শেখানো হয়, তখন ঠিক এই ভাবে, একটি তীর এসে আমার হৃদয়টাকে ছিদ্র করে দেয়। যখন দেখি বিজ্ঞানের ছেলে-মেয়েরা গণিত না পড়ে HSC পাশ করে যায়, তখন ঠিক এই ভাবে ৩৫০১ মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটি বুলেট এসে আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করে দেয়। পত্রিকায় যখন খবর পড়ি, গণিতে খারাপ করে একটি ছোট ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, তখন ঠিক এই ভাবে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়ে আমার হৃদয়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কষ্টে-দুঃখে আমার এই ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় আমাকে প্রশ্ন করে, What is Math???"

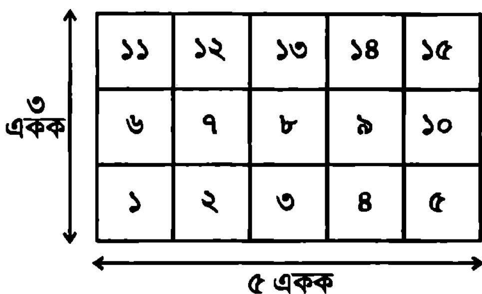
গণিত পড়ালেখার ক্ষেত্রে আমার মূল কথা হলো এ ম নি প, এসো মজা নিয়ে পড়ি। গণিত যেহেতু পৃথিবীর সবচেয়ে মজার বিষয় এবং যেহেতু পড়তে হবেই, তাহলে এসো মজা নিয়ে পড়ি– এ ম নি প। সে জন্যই গণিতের রঙ্গে। আর গণিতের রঙ্গের আজকের পর্বে আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে বোঝাবো, যেটা আমরা বুঝি, কিন্তু বুঝি না, জানি আবার জানি না। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল! ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা মুখস্থ বলে ফেলি হাপিস্টুভুমিস্টুচ্চতা!! ($\frac{1}{2}$ ×ভুমি×উচ্চতা)। কিন্তু এটা কী, কোত্থেকে এলো– সেগুলো আমরা অনেকেই জানি না। আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি, বলুন তো প্রথম কোন মানুষটি বলেছিল,

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে $\frac{1}{2}$×ভূমি×উচ্চতা, আমি নিশ্চত করে বলতে পারি আপনি জানেন না। আমিও জানি না। আসলে কেউই জানে না। তবে আমরা জানি যে, প্রাচীন মিশরে আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগের থেকে মানুষজন এটা সর্ম্পকে ধারণা রাখত। $\frac{1}{2}$×ভূমি×উচ্চতা- ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের এই সূত্রটা কোত্থেকে এলো, সেটা এবার একটু দেখার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক আমরা ত্রিভুজ কতটুকু জায়গা জুড়ে আছে সেটা মাপতে চাই, অর্থাৎ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল মাপতে চাই। যে কোন কিছু মাপতে হলে আমাদের একটা আদর্শের দরকার হয়। যেমন আমরা যদি কোন কিছুর ভর মাপতে চাই, অর্থাৎ একটা জিনিস কতটুকু ভারি সেটা মাপতে চাই, তখন আমরা কোন একটা পাথরের সাপেক্ষে এটাকে ওজন করি। যেমন : যদি ১ কেজি একটা পাথরের তুলনায় কোন কিছুর ভর ৫ গুণ হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলি সেটার ভর ৫ কেজি। ঠিক তেমনিভাবে যখন আমরা ক্ষেত্রফল মাপতে চাই, এরকম একটা আদর্শ কোন কিছু আমাদের দরকার হয়। সেই ক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে চিন্তা করা হয় একটা বর্গক্ষেত্রকে। প্রাচীন মানুষ যখন জমিজমা নিয়ে কাজ করতো, তখন মোটামুটি জমিগুলো ছিল চর্তুভুজ আকৃতিতে। এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুষম চতুর্ভুজ, যার চারটা বাহু সমান এবং চারটা কোণ সমান, এরকম ছিল বর্গক্ষেত্র। এজন্য বর্গক্ষেত্রকে আদর্শ হিসেবে চিন্তা করা হলো। তো যেই বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ১ একক, সেই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলকে বলা হলো ১ 'বর্গ'একক। 'বর্গ' থেকেই বর্গএকক। আর সেই বর্গটাকে বলা হলো একক বর্গ। তো এরকম, একক বর্গের তুলনায় কোন কিছুর ক্ষেত্রফল কত গুণ, সেটা দিয়ে আমরা বুঝে যাব ক্ষেত্রফল কত হবে। কী রকম? ধরা যাক, একটা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা মাপতে চাই, যার একবাহু হচ্ছে ৩ একক । আর নিচের দিকটাতে ৫ একক। তাহলে তার ক্ষেত্রফল কত হবে। [আমি জানি আপনার মুখ দিয়ে উত্তরটা বের হয়ে আসতে চাইছে, তবে কষ্ট করে চেপে থাকুন]। ধরা যাক আমরা কোন ফরমুলা জানি না। তাহলে কি ভাবে মাপবো? ১ বর্গ একক কী জিনিস সেটা আমরা এখন জানি। যে বর্গের



চারিদিকে ১ একক করে আছে, সেটাই হচ্ছে ১ বর্গ একক। এখন আমাদের আয়তক্ষেত্রের এমন কতগুলো এককবর্গ আছে সেটা আমরা দেখতে চাই। কিভাবে দেখা যায়?

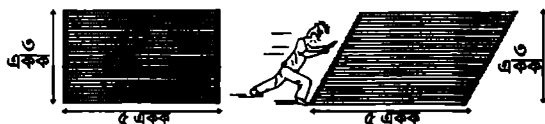
প্রস্থ বরাবর যেহেতু ৩ একক। আমরা এটাকে ৩ ভাগে ভাগ করে ফেললাম। আর অন্যদিকে যেহেতু ৫ একক, তাহলে সেটাকে ৫ ভাগে ভাগ করে ফেললাম। এখন



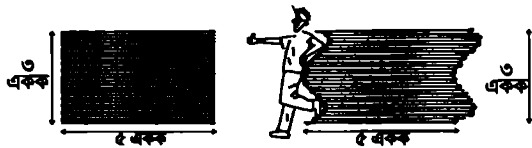
এখানে অনেক ছোট ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে। কতগুলো ঘর আছে? ১,২,৩ করে গুনলে আমরা দেখব এখানে ঘর আছে ১৫ টি। আরো খেয়াল করুন, প্রত্যেকটা ঘর কিন্তু ১ বর্গএকক করে করে। যেহেতু এমন ঘর আছে ১৫ টি, তার মানে এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ১৫ বর্গ একক। এখন আমরা একটু বুদ্ধিমান উপায়ে চিন্তা করি। এভাবে চিন্তা করি যে, এখানে আসলে ৩টা সারি আছে। প্রত্যেকটা সারিতে ৫টা করে ছোট ছোট ঘর আছে। তার মানে ৫×৩=১৫। তাহলে এটাই হচ্ছে এই জায়গার ক্ষেত্রফল। তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের একটা নতুন ফরমুলা পেয়ে যাচ্ছি এখন। ৫×৩ বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ। অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হয়ে গেল দৈর্ঘ্য×প্রস্থ। এই যে আমরা বললাম, দৈর্ঘ্য× প্রস্থ। এটাকে আমরা ভূমি×উচ্চতা-ও বলতে পারি।

এটা জানলে আমরা এখন সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল-ও বের করতে পারি একটু বুদ্ধি করে। কিভাবে? এই আয়তক্ষেত্রটাকে আমরা চিন্তা করি এভাবে যে, এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা মিলে এই আয়তক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছে।

চিন্তা সহজ করতে, ধরা যাক, অনেকগুলো ম্যাচের কাঠি এখানে আছে। এবার ম্যাচের কাঠিগুলোকে ছবির মতো করে ঠেলে বাঁকিয়ে দিই। তাহলেই কিন্তু একটা সামান্তরিক পেয়ে যাব

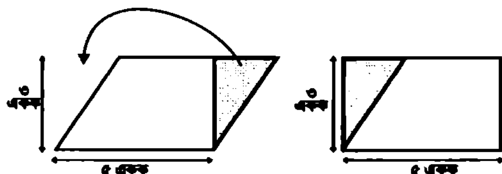


আমরা! এবং এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কিন্তু আয়তক্ষেত্রের মতোই হবে! কারণ এখানে তো কোন নতুন জায়গা তৈরি হয়নি, বা কিছু হারায়ও নি– যতটুকু আগে ছিল, ততটুকু জায়গাই সে নিয়েছে। তার মানে



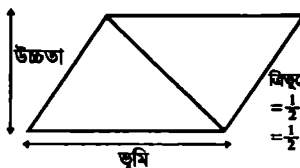
এই সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলও হবে ভূমি×উচ্চতা। অর্থাৎ সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে ৫×৩=১৫। যাদের এটা বিশ্বাস হচ্ছে না, তাদের জন্য আরেকভাবে দেখাতে পারি।

একটা কাজ করি, সামান্তরিক থেকে এই বাড়তি ত্রিভুজ অংশটুকু কেটে অন্যপাশে বসিয়ে দিলাম, তাহলে সামান্তরিক থেকে আয়তক্ষেত্র হয়ে গেল। এখনতো নিশ্চয়ই বলবেন ক্ষেত্রফল সমান, তাই না? তার মানে ভূমি আর উচ্চতা সমান হলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রটারই সমান হবে– সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে– ভূমি×উচ্চতা। আর



এই সামান্তরিককে যদি কানে ধরে মানে কর্ণ টেনে অর্ধেক করি, তাহলে পেয়ে যাব একটা ত্রিভুজ। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে $\frac{1}{2}$×ভূমি×উচ্চতা।

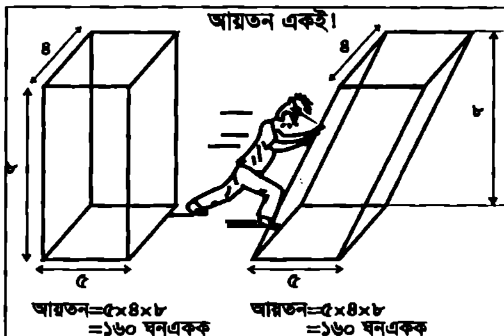
কিন্তু দাঁড়ান!!! একটু আগে আমরা বললাম, যে আয়তক্ষেত্রকে ঠেলে বাঁকিয়ে সামান্তরিক বানানো যায়। এখানে একটু চিন্তা করুন তো কেন আমরা বাঁকিয়ে সামান্তরিকই বানাবো। আমাদের যদি অন্য রকম কিছু ইচ্ছা করে যে, বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে



'জলতরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ খেলিয়া যায়' এরকম একটা কোন কিছু আমরা বানাবো, তাহলেও কি ক্ষেত্রফল ১৫ বর্গএকক ই হবে? উত্তর হচ্ছে অবশ্যই। এটাই হচ্ছে এখানে মজা। যখন আপনি একটা জিনিস

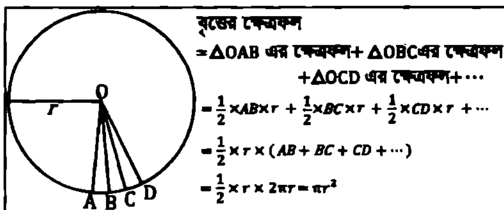
ভেতর থেকে জানবেন, তখন অনেক কিছু আপনি নিজের মতো করে চিন্তা করতে পারবেন। হ্যাঁ, আঁকিয়ে বাঁকিয়ে করলেও সেটার ক্ষেত্রফল ১৫ বর্গএকক ই হবে।

এখানে একটু বেশি চিন্তাশীল মানুষদের জন্য জানিয়ে রাখি, এভাবে বাঁকিয়ে চিন্তা করার ধারণাটি ত্রিমাত্রিক বস্তুদের আয়তনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়!



তো যাহোক, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যখন আমরা জানি, সেটা দিয়ে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল খুব সহজেই পেয়ে যাব। আমরা বৃত্তের পরিধি জানি $2\pi r$ । একটা বৃত্তের ব্যাসার্ধ হয় যদি r , পরিধি হবে $2\pi r$ । কারণ পরিধি/ব্যাস, এটাকেই আসলেই বলে π, তাহলে পরিধি = ব্যাস×π, সুতরাং পরিধি = $2\pi r$ চলে আসে।

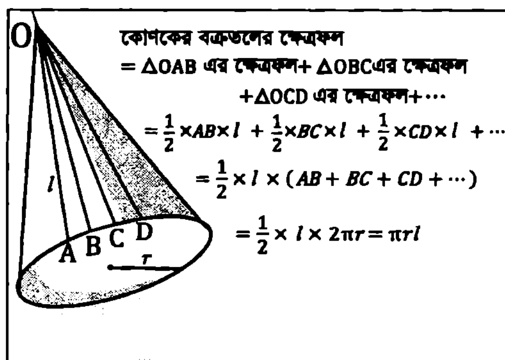
তো এই যে বৃত্তটা, বৃত্তের উপরে খুব কাছাকাছি দুইটা বিন্দু চিন্তা করা যাক। a আর B । কেন্দ্র O থেকে দুইটা রেখা টেনে a তে B যুক্ত করে দেই। তাহলে একটা ত্রিভুজের মতো পেয়ে যাব। আচ্ছা, aB তো সরলরেখা না, তাহলে ত্রিভুজ হলো কিভাবে। ধরে নিন, aB একটা সরলরেখাংশ, এটা খুব খুব ছোট তো, এটা ধরলে পাপ হবে না। অনেক ছোট হলে এটাকে একটা সরলরেখার মতো চিন্তাই করা যায়। তাহলে একটা ত্রিভুজ পেয়ে গেলাম আমরা– ΔOAB । তাহলে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কত? $\frac{1}{2}$ ×ভূমি×উচ্চতা। OAB ত্রিভুজের ভূমি যদি হয় aB ,তাহলে উচ্চতা কত হবে? এটা হলো r, ব্যাসার্ধ। তাহলে ΔOAB ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল



$\frac{1}{2}\times AB\times r$ । B এর অন্যপাশে আরেকটা বিন্দু নেয়া যাক, C। এবার OBC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে? $\frac{1}{2}\times BC\times r$। তারপাশে আরেকটা বিন্দু নেই D। তাহলে OBC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\frac{1}{2}\times CD\times r$। খেয়াল করে দেখুন আমি কী করতে যাচ্ছি। সবগুলো ত্রিভুজ যদি আমি এখন যোগ করি, তাহলে পুরো বৃত্তটার ক্ষেত্রফল আমি পেয়ে যাব। তাহলে পুরো বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত হবে?

বৃত্তের ক্ষেত্রফল= $\frac{1}{2}\times \mathbf{AB}\times r+\frac{1}{2}\times \mathbf{BC}\times r+\frac{1}{2}\times \mathbf{CD}\times r+\ldots$ এমন করে সবগুলো। দেখা যাচ্ছে সবগুলোর মধ্যে কারা যেন কমন আছে! হ্যাঁ, $\frac{1}{2}$ আর r আছে, চলুন এদেরকে কমন নিয়ে ফেলি। পাওয়া যাবে $\frac{1}{2}\times r\times(\mathbf{AB}+\mathbf{BC}+\mathbf{CD}+\ldots)$। এখন দেখুন এই AB+ BC+ CD যোগ করলে আমরা আসলে কি পাবো? ভালো করে দেখুন, এই ছোট ছোট দৈর্ঘ্য যদি আমি যোগ করি, তাহলেই তো আমরা পুরো বৃত্তের পরিধিটা আমরা পেয়ে যাব। বৃত্তটা পরিধিও আমরা পেয়ে যাব। অর্থাৎ $\mathbf{AB}+\mathbf{BC}+\mathbf{CD}+\ldots=2\pi r$ । তাহলে আমরা মোট ক্ষেত্রফল পাচ্ছি $\frac{1}{2}\times r\times 2\pi r$ । তাহলে 2, 2 মোকাবেলা। থাকবে πr^2। এটাই হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল।

বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা যেভাবে পেয়েছি, ঠিক একইভাবে একটা কোণকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়ে যাব। ধরা যাক, একটা সমবৃত্তভূমিক কোণক আছে।



সমবৃত্তভূমিক মানে হচ্ছে এর তলাটা মানে ভূমিটা হচ্ছে একটা সমান বৃত্ত। তাহলে ব্যাসার্ধ যদি হয় r , পরিধি হবে $2\pi r$ । কোণকের ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে, এই যে বাঁকা– হেলানো তলটা– সব জায়গায় এই হেলানো তলের দৈর্ঘ্যগুলো সমান থাকে। এই দৈর্ঘ্যটাকে আমরা নাম দিলাম l। এবার এই কোণকের উপরে ২টা বিন্দু চিন্তা করা যাক, a আর B। আর উপরের দিকে কোণকের শীর্ষ হচ্ছে O। এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই বাঁকানো তলের উপরে Oab ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে $\frac{1}{2}$×ভূমি×উচ্চতা। ভূমি হচ্ছে aB , আর উচ্চতা হচ্ছে l। মনে আছে তো, l কিন্তু এই বাঁকা তলটার দৈর্ঘ্য। তাহলে Oab ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $\frac{1}{2}\times \mathbf{AB}\times l$। এবার আগের মতোই B এর পাশে আরেকটা বিন্দু নিলাম C। এখন ত্রিভুজ OBC এর ক্ষেত্রফল হবে, $\frac{1}{2}\times \mathbf{BC}\times l$। ঠিক একই ভাবে যদি আরেকটা বিন্দু D থাকতো তাহলে ক্ষেত্রফল হতো $\frac{1}{2}\times \mathbf{CD}\times l$। সব জায়গায় কিন্তু $\frac{1}{2}$ আর l আছে। $\frac{1}{2}$ আর l যদি কমন নিয়ে নেই, তাহলে কোণকের বক্রতলের ক্ষেত্রফলকে আমরা লিখতে পারি, $\frac{1}{2}\times l\times(\mathbf{AB}+\mathbf{BC}+\mathbf{CD}+...)=\frac{1}{2}\times l\times 2\pi r$। আবারো 2, 2 মুকাবেলা। থাকবে $\pi r\ l$ । আর এটাই হচ্ছে সমবৃত্তভূমিক কোণকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল। কিভাবে ফরমুলাটা এলো এটাও আমরা জেনে গেলাম।

একইভাবে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারি। যেমন কেন একটা গোলকের ক্ষেত্রফল হয় $4\pi r^2$, সেটা আসলে খুবই মজা করে দেখানো যায়। সেটা আপনারাও চিন্তা করতে থাকুন, আমি অন্য কোন একটা পর্বে বোঝাবো। তবে এই পর্বটা শেষ করব একটা ছোট্ট ধাঁধা দিয়ে।

ধরুন পাঁচটা টুপি বা ক্যাপ আছে। তার মধ্যে ৩টা কালো, আর ২টা সাদা ক্যাপ। ৩টা ছেলে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে পেছনে যে আছে, সে সামনের দু'জনকে দেখতে পারে। মাঝখানে যে আছে, সে শুধু তার সামনের জনকে দেখতে পারে। সামনের জন কাউকে দেখতে পারে

না। তো ঐ যে ৩টা কালো আর ২টা সাদা ক্যাপ ছিল, সেখান থেকে ৩টা ক্যাপ এদের মাথায় পরিয়ে দেয়া হলো। পরিয়ে দেওয়ার পরে, পেছনের জনকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি তো তোমার সামনের দু'জনকে দেখতে পাও, তোমার মাথায় কী রঙের ক্যাপ আছে তুমি কি বলতো পারো?' সে বলল, 'না, আমি বলতে পারলাম না'। সবাই কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান আগেই বলে রাখি। মাঝখানের জনকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি তো তোমার সামনের জনকে দেখতে পাচ্ছ । পেছনের জন কী বলল সেটাও তুমি শুনেছো। তুমি কি বলতে পারো তোমার মাথায় কী রঙের ক্যাপ আছে'? সে বলল, 'না, আমিও বলতে পারছি না'। এবার একেবারে সামনে যে ছিল তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তুমি তো তোমার সামনের দু'জন কী বলেছে শুনতে পেরেছ। কিন্তু তোমার সামনে কেউই নেই। তুমি কি Idea করতে পারো তোমার মাথায় কী রঙের ক্যাপ আছে? সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি পারি'! সে বলল না কী রঙের ক্যাপ আছে। সে শুধু বলেছে 'আমি পারি' এবং আমরাও জানি সে আসলেই পেরেছে! আপনি বলুনতো তার মাথায় কী রঙের ক্যাপ ছিল?

ভালো থাকবেন সবাই!!!



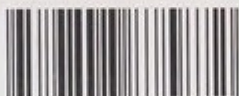
চমক হাসানের জন্ম ২৮ জুলাই, ১৯৮৬, কুষ্টিয়ায়। বাবা আহসানুল হক, মা নওরাজিস আরা জাহান। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া কুষ্টিয়াতেই। এরপর বুয়েট থেকে তড়িৎকৌশলে স্নাতক শেষ করে পিএইচডি করছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলাইনাতে। স্ত্রী ফিরোজা বহ্নির সঙ্গে বসবাস করছেন সাউথ ক্যারোলাইনার কলাম্বিয়া শহরে।

তার ভালো লাগে গাইতে, পড়তে, শিখতে, শেখাতে। চমক হাসান আশাবাদী মানুষ, স্বপ্ন দেখেন আলোকিত ভবিষ্যতের যখন এদেশের দেশের ছেলেমেয়েরা আনন্দ নিয়ে পড়ালেখা করবে, প্রশ্ন করতে ভয় পাবে না, মুখস্থ করে পাশ করবে না। ওরা অনুভব করবে কেন, কিভাবে, কী হচ্ছে। গণিত অলিম্পিয়াড শুরুর সাথে সাথে এই আন্দোলনটাও শুরু হয়ে গেছে। তিনি সেই আন্দোলনের একজন কর্মী। গণিত অলিম্পিয়াডের অ্যাকাডেমিক দলে প্রশিক্ষক, প্রশ্নপ্রণেতা ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন।

পাঠকের মন্তব্য তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্তব্য জানাতে পারেন ইমেইলে কিংবা ফেসবুক অফিসিয়াল পেজে।

ইমেইল
hasanchamok@yahoo.com

ফেসবুক পেইজ
www.facebook.com/chamok.hasan



মিডিয়া পার্টনার
the report.24.com
অনলাইন পার্টনার

